শোকর করে না। অথচ মুহূর্তের জন্যে গলা চেপে ধরলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। অথবা যদি কাউকে এমন কক্ষে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু উত্তপ্ত কিংবা এমন কূপে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু হিমশীতল, তবে দমবন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। হাঁ, যদি আটকে রাখার পর পুনরায় মৃতপ্রায় অবস্থায় বের করা হয়, তবে সে বুঝবে বায়ু একটি বড় নেয়ামত। তাই কথায় বলে— قَدْرِ نِعْمَتْ بَعْدِ زَوَالْ অর্থাৎ, 'হাতছাড়া হওয়ার পরই নেয়ামতের কদর হয়।' কিন্তু এটা মূর্খতা। কারণ, এতে নেয়ামত হাতছাড়া হওয়ার পর পুনরায় হস্তগত হওয়ার উপর শোকর নির্ভরশীল হবে। অথচ নেয়ামতের শোকর সার্বক্ষণিক হওয়া উচিত। আমরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কখনও চোখের শোকর করতে দেখি না। অন্ধ হওয়ার পর সে চোখের মর্যাদা বুঝে। এরপর যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে, তবে সে একে নেয়ামত মনে করে শোকর করে।

মানুষের বর্তমান অবস্থা এই যে, তারা কেবল ধন-সম্পদেরই শোকর করে— যদি তাতে তাদের কিছু বিশেষত্ব হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য সব নেয়ামত তারা বিস্মৃত হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গের কাছে তার দারিদ্র্যের অভিযোগ পেশ করে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করল। বুযুর্গ বললেন ঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহাম পাওয়ার বিনিময়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া পছন্দ করবে? লোকটি বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেনঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বোবা হয়ে যাওয়া মঞ্জুর করবে? লোকটি আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি কি খোঁড়া হতে সম্মত হবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি পাগল হওয়া পছন্দ করবে কি? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ তা হলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তোমার লজ্জা হয় না? তিনি পঞ্চাশ হাজার দিরহামেরও অধিক পরিমাণ সম্পদ তোমাকে দিয়ে রেখেছেন। এরপরও তুমি অভিযোগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছ?

একবার হযরত ইবনে সাম্মাক (রহঃ) সমকালীন খলীফার কাছে গেলেন। খলীফা গ্লাস হতে পানি পান করতে করতে বললেন ঃ আমাকে

উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ মনে করুন আপনি তৃষ্ণার্ত। সঙ্গের যাবতীয় নগদ অর্থকড়ি দিয়েই আপনি এক গ্লাস পানি পেতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন? সকল অর্থ দিয়ে পানি সংগ্রহ করবেন কি না? খলীফা আরয করলেন ঃ অবশ্যই পানির জন্যে সকল অর্থ দিয়ে দেব। ইবনে সাম্মাক বললেন ঃ যদি এরই বিনিময়ে গোটা রাজত্ব দিতে হয়, তবে তা-ও দিয়ে দেবেন। খলীফা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। ইবনে সাম্মাক বললেন ঃ তা হলে এরূপ রাজত্বের জন্যে আনন্দিত হওয়া ঠিক নয়, যার মূল্য এক গ্লাস পানির সমান। এ থেকে জানা গেল যে, পিপাসার সময় এক গ্লাস পানির মূল্য সারা বিশ্বের রাজত্বের চেয়েও বেশী।

সাধারণ মানুষ বিশেষ নেয়ামতকেই কেবল নেয়ামত মনে করে, ব্যাপক নেয়ামতকে নয়। এ পর্যন্ত আমরা কেবল ব্যাপক নেয়ামত বর্ণনা করেছি। তাই সংক্ষেপে কিছু বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রত্যক মানুষ যদি নিজের অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে একটি অথবা কয়েকটি নেয়ামত এমন পাবে, যা বিশেষভাবে তারই জন্যে নির্ধারিত। সকল মানুষ অথবা কোন মানুষ এতে তার সাথে শরীক নয়। তিনটি বিষয়ে যে কেউ একথা স্বীকার করে। প্রথম বুদ্ধিমত্তা, দ্বিতীয় চরিত্র এবং তৃতীয় জ্ঞান। বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তো এটা প্রসিদ্ধ যে, هَرْكَسْ رَاعَقْلِ خُوْدْ بَكَمَالْ نُمَايَدْ অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে পরিপূর্ণ মনে করে। এমন কোন মানুষ নেই, যে নিজের বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট নয় এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান মনে না করে। একারণেই কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে বুদ্ধিমত্তার জন্যে দোয়া করে না। এটাও বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গৌরব যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে মুক্ত, সে-ও এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং যে এ গুণে গুণান্বিত, সেও উল্লসিত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যখন আপন বিশ্বাসে অপরের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, তখন বাস্তবে তাই হলে এ নেয়ামতের শোকর করা তার উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বাস্তবে এরূপ না হলেও শোকর ওয়াজিব। কারণ, তার পক্ষে তো নেয়ামত বিদ্যমান আছে।

চরিত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের মধ্যে কিছু দোষ থাকা

পছন্দ করে এবং অপরের কিছু অভ্যাসকে খারাপ মনে করে। কিন্তু নিজেকে এগুলো থেকে মুক্ত মনে করে। সুতরাং তার শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার অভ্যাসসমূহকে সুন্দর করেছেন এবং অপরকে মন্দ অভ্যাস দিয়েছেন।

জ্ঞান-গরিমার অবস্থা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে এমন কিছু গোপন বিষয় জানে, যা অন্য কেউ জানে না। যদি জেনে ফেলে, তবে সে অপমানিত ও হেয় হয়ে যায়। তাই বিষয়গুলো জানার ব্যাপারে অন্য কেউ তার সাথে শরীক থাকে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যে তার বিষয়গুলো গোপন রেখেছেন, সেজন্যে আল্লাহর শোকর করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তার গোপন দোষগুলো মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, ভাল বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন এবং দোষসমূহের জ্ঞান তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেননি। উপরোক্ত তিনটি বিশেষ নেয়ামত প্রত্যেকেই স্বীকার করে।

সারকথা, মানবকুলের সামনে শোকরের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ এটাই যে, তারা যাহেরী, বাতেনী, বিশেষ ও ব্যাপক নেয়ামত সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। এক্ষণে গাফেল অন্তরসমূহের চিকিৎসা বর্ণনা করা হচ্ছে এই আশায় যে, হয়তো তারা গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত এবং শোকর আদায়ে তৎপর হবে। হুশিয়ার ও বিজ্ঞ অন্তরসমূহের চিকিৎসা এই যে, আমরা ব্যাপক নেয়ামতসমূহের যে সকল প্রকার ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছি, সেগুলো সম্পর্কে তারা গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে। আর যারা বিশেষ নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছুকে নেয়ামতই মনে করে না অথবা বিপদে পড়ে নেয়ামতকে চিনে, তাদের চিকিৎসা এই যে, তারা নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং জনৈক সূফী যা করতেন, তা করবে। তিনি প্রত্যহ একবার হাসপাতালে ও একবার গোরস্তানে গমন করতেন। হাসপাতালে গিয়ে অনেক মানুষকে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত দেখে নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার কথা ধ্যান করতেন, যাতে সুস্বাস্থ্য যে একটি বড় নেয়ামত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শোকর আদায় করা যায়। বুযুর্গ ব্যক্তি গোরস্তানে গিয়ে কল্পনা করতেন যে, মৃতরা

একদিনের জন্যে হলেও পৃথিবীতে ফিরে আসাকে সর্বাধিক পছন্দ করে। গোনাহগার অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আর নেককার আরও বেশী নেকী করার জন্যে এটা পছন্দ করে। এরপর তিনি ভাবতেন যে, যার জন্যে তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, তা তো আমার অর্জিত আছে। অর্থাৎ, আমি অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ এবং অধিক নেকী অর্জন এই মুহূর্তে করতে পারি। সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো আমি এ কাজেই ব্যয় করি না কেন? এ দিনগুলোকেই আমি আল্লাহর নেয়ামত মনে করে নেই না কেন? এ চিকিৎসায় আশা করা যায়, গাফেল ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে অবগত হয়ে শোকরে তৎপর হবে।

হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রহঃ) পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। প্রত্যহ গলায় বেড়ী পরে তিনি এই কবরে শয়ন করতেন এবং বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করি।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ হে রবী, তোর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তুই সেই সময়ের পূর্বে কিছু করে নে, যখন পুনরায় প্রেরণের আবেদন করবে কিন্তু তোকে প্রেরণ করা হবে না।

যে সকল অন্তর শোকর থেকে দূরে থাকে, একথা জেনে নেয়াও তাদের এক চিকিৎসা যে, যে নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয় না, সে নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পুনর্বার পাওয়া যায় না। এ কারণেই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ লোকসকল, তোমরা নেয়ামতসমূহের শোকর অবশ্যই কর। এটা বিরল যে, নেয়ামত একবার চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নেয়ামতসমূহ বন্য পশুসদৃশ। এগুলোকে শোকর দ্বারা বন্দী করে রাখ। হাদীসে আছে—যখন কারও প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বেশী হয়, তখন তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনও

বেড়ে যায়। সে যদি এসব প্রয়োজন পূরণে অলসতা করে, তবে প্রকারান্তরে নেয়ামত হারিয়ে ফেলার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

যেসব বিষয়ে সবর ও শোকর পরস্পর জড়িত ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুতেই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত পাওয়া যায়। এতে মুসীবতের অস্তিত্ব না থাকাই জরুরী হয়ে পড়ে। মুসীবত না থাকলে সবর কিসের উপর হবে? আর মুসীবত থাকলে শোকর কিরূপে হবে? কেননা, মুসীবতে সবর করার মধ্যে ব্যথা ও কষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। আর শোকর হল আনন্দজ্ঞাপক। অতএব, সবর ও শোকর পরস্পরবিরোধী। এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, নেয়ামত যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুসীবতও বিদ্যমান। মুসীবত দূর হওয়াকে নেয়ামত এবং নেয়ামত দূর হওয়াকে মুসীবত বলা হয়। অতএব, উভয়টির অস্তিত্ব জরুরী।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নেয়ামত দু'প্রকার। একটি সর্বাবস্থায় নেয়ামত; যেমন খোদায়ী নৈকট্যের সৌভাগ্য, ঈমান ও সচ্চরিত্রতা। দ্বিতীয় প্রকার যা একদিক দিয়ে নেয়ামত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত। যেমন অর্থসম্পদ। ধর্মীয় কল্যাণ লাভের দিক দিয়ে এটি নেয়ামত এবং ধর্মের অনিষ্ট হলে এটি মুসীবত। এমনিভাবে মুসীবতও দু'প্রকার। এক, যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, যেমন আখেরাতে আল্লাহ থেকে দূরে থাকা দুনিয়াতে কুফর ও অসচ্চরিত্রতা। এগুলোর পরিণতি সর্বাবস্থায় মুসীবত। দুই, যা একদিক দিয়ে মুসীবত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত নয়; যেমন দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও ভয়ভীতি।

অতএব, যা সর্বাবস্থায় নেয়ামত, তার জন্যে সর্বাবস্থায় শোকর করা উচিত। যা দুনিয়াতে সবদিক দিয়ে মুসীবত, তার জন্যে সবর করার আদেশ নেই; যেমন কুফরের জন্যে সবর করার কোন অর্থ হয় না। বরং কুফর পরিত্যাগ করা কাফেরের জন্যে অপরিহার্য। এ থেকে জানা গেল যে,

দুনিয়াতে যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, তা সবর করার জায়গা নয়। অতএব, একই জায়গায় সবর ও শোকর একত্রিত হতে পারে যদি সেটা এমন মুসীবত হয়, যা একদিক দিয়ে মুসীবত কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নেয়ামত হয়। উদাহরণতঃ ধনাঢ্যতা নেয়ামত হলেও মাঝে মাঝে এর কারণে ধনী ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততি প্রাণ হারায়। এমনিভাবে অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতও নেয়ামতওয়ালার জন্যে মুসীবত হতে পারে এবং পার্থিব মুসীবতও মুসীবতওয়ালার জন্যে নেয়ামত হতে পারে; যেমন অনেক মানুষ দারিদ্র্য ও রোগব্যাধিকেই পছন্দ করে। অতএব, এগুলো মুসীবত হলেও তাদের জন্যে নেয়ামত। কারণ, ধন-সম্পদ বেশী থাকলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে মানুষ অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে। সেমতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِى الْأَرْضِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে রিযকে স্বাচ্ছন্দ্য দেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে এ কারণে যে, সে নিজেকে ধনাঢ্য দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন কেউ নিজের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাও তদ্রূপ।

জ্ঞান নিঃসন্দেহে একটি নেয়ামত। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এটাই দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। তখন অজ্ঞতাকেই নেয়ামত বলতে হয়। উদাহরণতঃ মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান যদিও নেয়ামত, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে না জানাই নেয়ামত। কারণ, মৃত্যুর সময় জানা হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন তিক্ত হয়ে যাবে এবং সে কোন কাজই করতে সক্ষম হবে না। এমনিভাবে নিজের সম্পর্কে এবং

আত্মীয়দের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস না জানা নেয়ামত। কেননা, এই বিশ্বাস জানা হয়ে গেলে দুঃখ পেতে হত এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনক্ষণ, শবেকদর ও জুমআর মকবুল মুহূর্তটি গোপন রেখেছেন। এটাও নেয়ামত। কেননা,এটা গোপন থাকার কারণে অন্বেষণে ইচ্ছা ও চেষ্টা অধিক করতে হয়। ফলে, সওয়াব বেশী হয়।

অতএব, যে অবস্থাকে সর্বদিক দিয়ে মুসীবত এবং সর্বাবস্থায় নেয়ামত বলা যায় না, তাতে সবর ও শোকর উভয়টি করতে হবে। প্রশ্ন হয় যে, সবর ও শোকর তো একটি অপরটির বিপরীত। এগুলো একত্রিত হবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, মানুষ একই কারণে কখনও দুঃখ করে এবং কখনও আনন্দিত হয়। সুতরাং দুঃখের জন্যে সবর করবে এবং আনন্দের জন্যে শোকর। উদাহরণতঃ পার্থিব বিপদ ও রোগব্যাধিতে যদিও দুঃখ হয়, যা সবর দাবী করে; কিন্তু পাঁচটি কারণে বুদ্ধিমানের উচিত এগুলোতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করা। এক, যে বিপদ ও রোগব্যাধি এখন রয়েছে, এরচেয়ে ভয়ংকর কোন রোগ ও বিপদ সম্ভব। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এই রোগ ও বিপদকে দ্বিগুণ করে দেন, তবে বাধা দেয়ার সাধ্য কার? সুতরাং প্রত্যেক অসুখ-বিসুখ ও বিপদে মানুষের শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে বড় অসুখ ও বিপদ দেননি। দুই, বিপদ পার্থিব ব্যাপারে হয়েছে দ্বীনদারীতে হয়নি— এটাও শোকরের অন্যতম কারণ।

সেমতে কোন এক ব্যক্তি হযরত সহল তস্তরীর কাছে অভিযোগ করল ঃ আমার ঘরে এক চোর ঢুকে সকল আসবাব নিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর যে, শয়তান তোমার অন্তরে প্রবেশ করে তোমার ঈমানকে পন্ড করে দেয়নি। হযরত আবু এয়াযীদ বুস্তামী এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ ছাইয়ের ঝুড়ি তার উপর ঢেলে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদা আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, এই পরিস্থিতিতে সেজদা কেন? তিনি বললেন ঃ আমি নিজের উপর আগুন পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং কেবল ছাই পতিত হওয়া আমার জন্যে নেয়ামত।

প্রশ্ন হল, মুসীবতে আমরা কেমন করে আনন্দিত হব, অথচ দেখা যায়, কোন কোন লোক আমাদের চেয়ে বেশী গোনাহ করে; কিন্তু তাদের উপর আমাদের মত মুসীবত আসে না। কাফেররা হরহামেশা কুফর করেও আমাদের মত মুসীবতে পতিত হয় না। জওয়াব এই যে, কাফেরের উপর অনেক বেশী মুসীবত আসবে—আজ না হয় মৃত্যুর পরে আসবে। দুনিয়াতে তাকে সময় দেয়া হয়, যাতে অনেক গোনাহ করে নেয় এবং আযাব দীর্ঘ হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا

অর্থাৎ, আমি কাফেরদেরকে এ কারণেই অবকাশ দেই, যাতে তাদের গোনাহ বেড়ে যায়।

গোনাহগার সম্পর্কে কথা হল, কেউ যে আমাদের চেয়েও বেশী গোনাহগার, তা কেমন করে জানা গেল? আল্লাহর সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে অনেকের অন্তরের ধৃষ্টতা এত জঘন্য থাকে যে, এর সামনে বাহ্যিক মদ্যপান ও যিনা কিছুই নয়। এরূপ গোনাহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, তোমরা একে সহজ মনে কর, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ।

যদি বাস্তবে কারও গোনাহ বেশীও হয়, তবে এটা সম্ভব যে, তার শাস্তি আখেরাতে বেশী হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীবতে রয়েছে, তার তো শোকর করা দরকার যে, তাকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, দুনিয়াতে যার শাস্তি হয়ে যায়, তাকে আখেরাতে পুনরায় শাস্তি দেয়া হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ গোনাহ করে এবং দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদ এসে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে যান। মুসীবতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করার এ হচ্ছে তৃতীয় কারণ।

চতুর্থ কারণ এই যে, এই মুসীবত লওহে মাহফুযে লিখিত ছিল যে,

অমুক ব্যক্তির উপর আসবে। এটা ঘটা অপরিহার্য ছিল। এখন যখন অল্প কিংবা সবটুকু ঘটে গেল, তখন এটাই নেয়ামত।

পঞ্চম কারণ এই যে, মুসীবতের সওয়াব মুসীবতের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। কেননা, দুনিয়ার মুসীবত দু'কারণে আখেরাতের পথ। প্রথম, সে কারণে বিস্বাদ ও তিক্ত ঔষধ রোগীর জন্যে নেয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন বান্দা যখন দেখবে, মুসীবতের কারণে সওয়াব পাওয়া যায়, তখন সে এই নেয়ামতের শোকর করবে। যেমন শিশুরা বড় হওয়ার পর এবং বুদ্ধিমান হওয়ার পর পিতা ও শিক্ষকের প্রহারের শোকর আদায় করে। দ্বিতীয়, সকল পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। পক্ষান্তরে নাজাতের মূলকথা হচ্ছে দুনিয়া থেকে অন্তরের বিচ্ছিন্নতা। বলা বাহুল্য, যদি পার্থিব উদ্দেশ্য অনুযায়ী নেয়ামতসমূহ মুসীবত ছাড়াই পাওয়া যায়, তবে এতে দুনিয়ার প্রতি অন্তরের টান আরও বেড়ে যায়। এমনকি, মানুষের জন্যে দুনিয়া জান্নাতের অনুরূপ হয়ে যায়। আর যদি মুসীবত ও আপদ আসতে থাকে, তবে দুনিয়ার প্রতি অন্তর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়; বরং দুনিয়া কারাগারের মত হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ অর্থাৎ, 'দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফেরের জান্নাত। কাফের তাকে বলা হয়, যে আল্লাহ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর মুমিন তাকে বলা হয়, যে আন্তরিকভাবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং এখান থেকে পলায়ন করতে আগ্রহী।

মোটকথা, বর্ণিত পাঁচটি কারণে মুসীবতে নেয়ামতও থাকে। তাই মুসীবতের জন্যে আনন্দিতও হতে হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, সে মুসীবতেও শোকর করবে। আর যে এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তার পক্ষে শোকর করা অসম্ভব। মুসীবতেও সবর করা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে—

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবত দেন।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন— আমি আমার বান্দার দেহের, অর্থ-সম্পদের অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি। সে যদি "সবরে জামীল" সহকারে সেই মুসীবত সহ্য করে, তবে কিয়ামতে তার আমলের জন্যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করতে অথবা আমলনামা খুলতে আমি লজ্জাবোধ করি। এক হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার উপর কোন মুসীবত এলে সে যদি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করে এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ, 'ইলাহী! আমাকে আমার মুসীবতের প্রতিদান দাও এবং এর পরে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর,'

তবে আল্লাহ তা'আলা তাই করেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি রুগ্ন। তিনি বললেন ঃ যে বান্দার ধন বিনষ্ট হয় না এবং অসুখ-বিসুখ হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে প্রিয় করে নেন, তখন তাকে মুসীবতে ফেলেন এবং যখন মুসীবতে ফেলেন, তখন সবর দান করেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন একটি মর্তবা থাকে, যাতে সে আমলের মাধ্যমে পৌঁছতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তার দেহের উপর কোন মুসীবত প্রেরণ করেন, যার কারণে সে সেই মর্তবা পেয়ে যায়। খাববাব ইবনে ইরত (রাঃ) বর্ণনা করেন—একবার আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে ছিলেন। আমি অভিযোগের সুরে তাঁকে বললাম ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের সাহায্যের জন্যে দোয়া করেন না কেন? কাফেররা আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে মাটি খনন করে গোর দেয়া হত এবং

করাত দিয়ে তাদের মস্তক চিরে দেয়া হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করত না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তিকে শাসনকর্তা অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এরপর সেখানেই সে মারা যায়, সে শহীদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রহার করতে করতে মেরে ফেলে, তবু শহীদ হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান এবং তাকে প্রিয় করে নিতে চান, তখন তার উপর মুসীবত ঢেলে দেন এবং বৃষ্টির ন্যায় বিপর্যয় বর্ষণ করেন। যখন সেই বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ এই কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হয়। যখন পুনরায় ডাকে এবং "ইয়া রব" বলে, তখন আল্লাহ এরশাদ করেন—বান্দা! কি বলতে চাও, বল। আমি হাযির। তুমি যা চাইবে তাই দেব। যদি দুনিয়াতে কোন উত্তম বস্তু তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দেই, তবে তোমার জন্যে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার কাছে রেখে দেই। যখন কিয়ামত হবে, তখন আমলকারীরা হাযির হবে। তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমল দাঁড়িপাল্লায় ওযন করা হবে এবং পুরাপুরি সওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু যখন মুসীবতওয়ালা হাযির হবে, তখন তার জন্যে দাঁড়িপাল্লাও স্থাপন করা হবে না এবং আমলনামাও খোলা হবে না। তাদের উপর সওয়াব এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে, যেমন মুসীবত ঢেলে দেয়া হয়েছিল। তখন দুনিয়াতে যারা বিপদমুক্ত ছিল, তারা বাসনা করবে—কি চমৎকার হত যদি আমাদের দেহও কাঁচি দিয়ে কাটা হত এবং মুসীবতওয়ালাদের অনুরূপ সওয়াব আমরাও পেতাম। এ কারণেই কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরা তো তাদের পুরস্কার বেহিসাব পাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কোন এক পয়গম্বর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলেন— ইলাহী! মুমিন বান্দা তোমার আনুগত্য করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু তুমি

দুনিয়াকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখ এবং মুসীবত প্রেরণ কর। অপরপক্ষে কাফের তোমার আনুগত্য করে না এবং গোনাহে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তুমি তার কাছ থেকে মুসীবতকে সরিয়ে রাখ। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান কর। ব্যাপার কি? এরূপ কেন? আল্লাহ পাক পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন ঃ বান্দাও আমার, মুসীবতও আমার। প্রত্যেকেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসল ব্যাপার এই যে, মুমিন বান্দার গোনাহ হয়ে যায়। তাই তার কাছ থেকে দুনিয়াকে আলাদা রাখি এবং মুসীবত পাঠিয়ে দেই, যাতে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। সে যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমি তার পুণ্যের প্রতিদান দেব। পক্ষান্তরে কাফেরের কিছু পুণ্য থাকে। তাই আমি তাকে রিযক বেশী দেই এবং মুসীবতকে দূরে রাখি, যাতে সে তার পুণ্যের বদলা দুনিয়াতে পেয়ে যায় এবং যখন আমার কাছে আসে, তখন পাপকর্মের শাস্তি দেই। কথিত আছে, যখন مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (অর্থাৎ, যে মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে) আয়াতখানি নাযিল হল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতের পর আনন্দ কেমন করে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না, যদ্দরুন দুঃখ কর? এটাই তোমার মন্দকর্মের প্রতিদান। অর্থাৎ, সকল মুসীবত তোমার গোনাহের কাফফারা হয়ে থাকে।

হযরত উকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করে যাচ্ছেন এবং সে নিজের গোনাহে বাড়াবাড়ি করে যাচ্ছে, তখন জেনে নাও যে, এটা তাকে অবকাশ দেয়ার জন্যে করা হচ্ছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ -

অর্থাৎ, যখন তারা নির্দেশিত কাজ পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাদের

সামনে যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা এসব কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে খুব উল্লসিত হয়ে গেল, তখন হঠাৎ করে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবী পথিমধ্যে জাহেলিয়াত যুগের পরিচিতা এক মহিলাকে দেখলেন। তিনি তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু চলতে চলতে পেছন ফিরে মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্রাচীরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেলেন। ফলে, তার চেহারা যখম হয়ে গেল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোরআন মজীদের এমন একটি আয়াত বলে দিচ্ছি, যা সকল আয়াতের তুলনায় অধিক আশাব্যঞ্জক। শ্রোতারা আরয করল ঃ বলুন। তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে মুসীবত আসে, তা তোমাদের হাতেরই অর্জিত। আল্লাহ অনেক কিছু মাফ করে দেন।

মোটকথা, পার্থিব যাবতীয় মুসীবত গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন, তখন পুনরায় শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই। আর যদি দুনিয়াতে মাফ করে দেন, তবে তাঁর কৃপা চায় না যে, কিয়ামতে শাস্তি দেয়া হোক।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বান্দার দুটি ঢোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়—এক, ক্রোধের ঢোক, যা সহনশীলতার কারণে বান্দা গিলে ফেলে। দুই, মুসীবতের ঢোক, যা সবরের কারণে গিলে ফেলে। বান্দার দুটি বিন্দুও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়—এক, রক্তবিন্দু, যা

তাঁর পথে জেহাদে প্রবাহিত হয়। দুই, অশ্রুবিন্দু, যা অন্ধকার রাতে বান্দার চোখ থেকে সেজদারত অবস্থায় পতিত হয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ একে দেখে না। বান্দার দুটি পদক্ষেপও আল্লাহর কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়। এক, ফরয নামাযের জন্যে পদক্ষেপ এবং দুই, আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের পদক্ষেপ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, পয়গম্বর হযরত সোলায়মান (আঃ) -এর দুই পুত্রের ইন্তেকালে তিনি নিরতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। যেন তারা বাদী ও বিবাদী। তাদের একজন আরয করল ঃ আমি শস্যক্ষেত বপন করেছিলাম। যখন শস্য তৈরী হয়ে গেল, তখন এই ব্যক্তি ক্ষেতটি দলিত-মথিত করে দিয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বক্তব্য কি? সে আরয করল ঃ আমি পথ ধরে যেতে যেতে এক ক্ষেতের ধারে পৌঁছলাম। ডানে-বামে লক্ষ্য করে দেখলাম, পথ ক্ষেতের মধ্য দিয়েই ছিল। তাই আমি সেখান দিয়েই গমন করেছি। হযরত সোলায়মান বাদীকে বললেন ঃ তুমি পথের উপর বীজ বপন করলে কেন? তোমার জানা নেই যে, মানুষের চলার পথ অবশ্যই রাখতে হবে? সে আরয করল ঃ তাহলে আপনি পুত্রদের জন্যে এত ভেঙ্গে পড়েছেন কেন? আপনি জানেন না যে, মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের সড়ক? অতঃপর হযরত সোলায়মান তওবা করলেন। পুত্রদের জন্যে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করলেন না।

হযরত ইবনে মসউদ বলখী (রহঃ) বলেন ঃ মুসীবত এলে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে অথবা মুষ্টি দ্বারা বুকে আঘাত করে, সে যেন বল্লম দ্বারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ আগুন দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা করা হয়। আর ঈমানদার বান্দার পরীক্ষা হয় মুসীবত দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তখন তাদেরকে মুসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে নাখোশ থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি নাখোশ থাকেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন ঃ একদিন আমার চোয়ালে তীব্র ব্যথা

ছিল। আমি আমার পিতৃব্যকে বললাম ঃ চোয়ালের ব্যথার কারণে সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এ কথাটি আমি তিন বার তার কাছে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এক রাতের ব্যথায় এত অভিযোগ করছ। আমি ত্রিশ বছর ধরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি। কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি।

উপরোক্ত হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে মুসীবতের ফযীলত জানা যায়। এগুলো শুনে কেউ বলতে পারে যে, তা হলে তো দুনিয়াতে নেয়ামতের তুলনায় মুসীবত আসাই উত্তম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে মুসীবতের প্রার্থনা করা জায়েয হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে, মুসীবতের আবেদন করা না-জায়েয এবং এর জায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং মুসীবত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শরীয়তসিদ্ধ। হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণের উক্তি এটাই ছিল—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

অর্থাৎ, হে পালনকর্তা! আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং আখেরাতের সৌন্দর্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। কেননা, নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু একীন ছাড়া কেউ পায়নি। এখানে একীন অর্থ অন্তরের সুস্থতা, যাতে সন্দেহ ও অজ্ঞতার রোগ নেই। কেননা, অন্তরের সুস্থতা দৈহিক সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ বলেন ঃ সবর শোকরের চেয়ে উত্তম। কারও মতে শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ উভয়টি সমান। কয়েক জনের অভিমত এই যে, কোন কোন অবস্থায় সবর শ্রেষ্ঠ এবং কোন কোন অবস্থায় শোকর শ্রেষ্ঠ। এ সকল উক্তির প্রবক্তারা নিজ নিজ উক্তির পক্ষে অত্যন্ত অবিন্যস্ত দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল

হয় না। তাই এগুলোর অবতারণা না করে আসল সত্য প্রকাশ করাই উত্তম।

এ প্রসঙ্গে দু'প্রকার বক্তব্য পেশ করা যায়। এক, কেবল বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা এবং অধিক ঘাঁটাঘাঁটিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। এ ধরনের বক্তব্যই সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্যে উত্তম। কেননা, তাদের বোধশক্তি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, সবর উত্তম। যদিও শোকরের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস অনেক। কিন্তু সবরের ফযীলত তদপেক্ষাও বেশী পরিলক্ষিত হয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, যে পৃথিবীতে সর্বাধিক শোকরকারী ছিল। অতঃপর তাকে শোকরকারীদের সওয়াব প্রদান করা হবে। এরপর সর্বাধিক সবরকারীকে আহ্বান করে তাকে বলা হবে—আমি এই শোকরকারীকে যতটুকু সওয়াব দিয়েছি, ততটুকু তোমাকে দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে কি? সে বলবে ঃ অবশ্যই সন্তুষ্ট হব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করবেন— তা হবে না। আমি তোমাকে নেয়ামত দিয়েছি। তুমি শোকর করেছ। তোমাকে মুসীবতে ফেলেছি। তুমি সবর করেছ। কাজেই আমি আজ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেব। কোরআন পাকে আছে ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ, যে খাদ্য খেয়ে শোকর করে, সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে রোযা রাখে এবং সবর করে।

এতেও সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কেননা, শোকরের মাত্রা বৃদ্ধিকে সবরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবর শ্রেষ্ঠ না হলে এর সাথে শোকরের তুলনা করা হত না। অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) রাজত্বের কারণে সকলের

পরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর আমার সাহাবীগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবেন। এর বিপরীতে ফকীর ও মুসীবতগ্রস্তদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, জান্নাতের সকল দরজারই দুটি করে কপাট। কিন্তু সবর-দরজার কপাট একটিই। সর্বপ্রথম যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে হবে মুসীবতওয়ালা। তাদের নেতা হবেন হযরত আইউব (আঃ)। এটা এমন বক্তব্য, যাতে সাধারণ মানুষ তুষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই তাদের ধর্মীয় উপযোগিতা নিহিত।

দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলেম ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিষয়সমূহের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং আমরা বলি, দুটি অস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা চলে না যে পর্যন্ত প্রত্যেকটির স্বরূপ স্পষ্ট না হয়ে যায়। স্পষ্ট হওয়ার পর যদি সে বিষয়দ্বয়ের বিভিন্ন প্রকার থাকে, তবে তাদের মধ্যেও সমষ্টিগতভাবে তুলনা চলে না; বরং প্রত্যেকটি প্রকারকে আলাদা আলাদা করে তুলনা করা অত্যাবশ্যক। সবর ও শোকরেরও অনেক প্রকার ও শাখা রয়েছে। তাই অস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হতে পারে না; বরং উভয়ের প্রত্যেকটি প্রকারকে পরস্পরে তুলনা করতে হবে।

সবর ও শোকর প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত—মারেফত (জ্ঞান), হাল ও আমল। এখন একটির মারেফতকে অপরটির হাল ও আমলের সাথে তুলনা করা যাবে না; বরং একটির হালকে অপরটির হালের সাথে, একটির মারেফতকে অপরটির মারেফতের সাথে এবং একটির আমলকে অপরটির আমলের সাথে তুলনা করা চলে। এতে পারস্পরিক মিল প্রকাশ পাবে এবং একারণে একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর জানা যাবে। উদাহরণতঃ চক্ষু সম্পর্কে শোকরকারীর মারেফত হল চোখের নেয়ামতটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা এবং সবরকারীর মারেফত হল অন্ধত্বকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। সুতরাং এখানে শোকরের মারেফত ও সবরের মারেফত সমান সমান। একটির উপর অপরটির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এটা তখন, যখন সবরের অর্থ বালা-মুসীবতে সবর নেয়া হয়। কিন্তু সবর কখনও এবাদতেও

হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে সবর ও শোকর একই হবে। কেননা, এবাদতে সবর করা হুবহু এবাদতে শোকরগুযারী করা। সুতরাং এখানেও একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। বালা-মুসীবতে সবরের বিধান এই যে, মুসীবত বলা হয় নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়াকে। চক্ষু একটি জরুরী নেয়ামত। এর বিলুপ্তিতে সবরের উদ্দেশ্য এজন্য অভিযোগ না করে আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং অন্ধত্বের কারণে কতক গোনাহের অনুমতি না চওয়া। অপরদিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির শোকর আমলের দিক দিয়ে এই যে, একে গোনাহের কাজে ব্যবহার করবে না বরং আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে। এই উভয় প্রকার শোকর সবর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণতঃ অন্ধ ব্যক্তির সুন্দরী মহিলাদের থেকে সবর করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার উপর পতিত হলে সে যদি সবর করে, তবে সে চোখের নেয়ামতের শোকরকারী হবে। আর দ্বিতীয় বার দেখলে এই নেয়ামতের নাশোকরী হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, সবর শোকরের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে আনুগত্যের কাজে চক্ষু ব্যবহার করলে আনুগত্যে সবর করা হবে।

মানুষ কখনও চোখের নেয়ামতের শোকর এভাবে আদায় করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার অদ্ভুত কারিগরী দেখে, যাতে এর মাধ্যমে মারেফত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ধরনের শোকর সবর অপেক্ষা উত্তম। নতুবা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) যিনি পয়গম্বরগণের মধ্যে চক্ষুষ্মান ছিলেন না, তাঁর মর্তব হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের মর্তবার চেয়ে বেশী হওয়া জরুরী হবে। কারণ, তিনি দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে সবর করেছিলেন, যা মূসা ও অন্য পয়গম্বরগণ করেননি, অথচ হযরত শোয়ায়ব (আঃ) -এর মর্তবা বেশী নয়।

মানুষ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তবে অতিরিক্তকে নেয়ামত বলা হবে। এর শোকর হল, তা দান-খয়রাতে ব্যয় করা—অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। এই শোকরকে সবরের সাথে তুলনা করলে শোকর হবে উত্তম। কেননা, এই শোকর সবরকেও নিজের মধ্যে শামিল রাখে। কারণ, এখানে সবরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হয়ে

ফকীরদের উপর ব্যয় করার কষ্ট সহ্য করা এবং বিলাসিতায় ব্যয় না করা। এরূপ শোকরের মধ্যে দুটি বিষয় বিদ্যমান। তার একটি হচ্ছে সবর। অতএব, সবর হচ্ছে শোকরের অংশ। সুতরাং শোকর বড় এবং সবর তার ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু যদি এই নেয়ামতকে গোনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ ভোগবিলাসে ব্যয় করে শোকর করা হয়, তবে সবর শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে এবং সবরকারী ফকীর এই ধনবানের তুলনায় উত্তম হবে। কোরআন ও হাদীসসমূহে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় এই বিশেষ স্তরের সবরই উদ্দেশ্য। কেননা, মানুষ নেয়ামতের অর্থ ধন-সম্পদ ভোগ করা, শোকরের অর্থ মুখে আলহামদু লিল্লাহ বলা এবং নেয়ামত দ্বারা গোনাহে সাহায্য না নেয়াকেই বুঝে। এটা কেউ বুঝে না যে, নেয়ামতকে কেবল এবাদতের কাজেই ব্যয় করতে হবে।

সারকথা, সাধারণ মানুষ যাকে সবর বলে, তা সেই শোকর অপেক্ষা উত্তম। হযরত জুনায়দ (রহঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধনশালীর প্রশংসা ধনের কারণে নয়, তেমনি ফকীরের তারীফ ধন না থাকার কারণে নয়; বরং তাদের নিজ নিজ অবস্থার জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো যথাযথ পালন করলেই তারা প্রশংসার যোগ্য হয়। কিন্তু ধনী অবস্থার শর্তসমূহ মনের অনুকূলে। এতে ভোগ, আনন্দ ইত্যাদি বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ফকীর অবস্থার শর্তসমূহ ফকীরের মনকে কষ্ট দেয়, তাকে আবদ্ধ ও ভগ্নোৎসাহ রাখে। বলা বাহুল্য, যখন তারা উভয়েই আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ নিজ অবস্থার শর্ত পালন করবে, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে রাখবে এবং ভগ্নোৎসাহ থাকবে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, যে নিজেকে ভোগ-বিলাসে রাখবে। হযরত জুনায়দের এই বর্ণনাই বাস্তব সম্মত।

কথিত আছে, আবুল আব্বাস ইবনে আতা এ প্রশ্নে তাঁর বিপরীত বলতেন। তাঁর উক্তি ছিল, যে ধনী শোকর করে, সে সবরকারী ফকীরের চেয়ে উত্তম। এতে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া করেন। ফলে তিনি অনেক অনিষ্টের সম্মুখীন হন। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পুত্ররা

নিহত হয়। চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনি পাগলের মত জীবন যাপন করেন। নিজেই বলতেন ঃ জুনায়দের বদদোয়া আমার উপর লেগে গেছে। এরপর তিনি নিজ উক্তি প্রত্যাহার করে নেন এবং সবরকারী ফকীরকে ধনী শোকরকারীর উপর অগ্রাধিকার দিতে থাকেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন কোন অবস্থায় উভয় উক্তিই ঠিক। অর্থাৎ, অনেক সবরকারী ফকীর শোকরকারী ধনী অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু কখনও এর বিপরীত হয়। তবে সেই শোকরকারী ধনী উত্তম হয়, যে নিজেকে ফকীরের মত মনে করে এবং নিজের জন্যে যতটুকু ধন-সম্পদ প্রয়োজন, ততটুকু রেখে অবশিষ্ট ধন হয় খয়রাত করে দেয়, না হয় অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের জন্যে রেখে দেয়। অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে এবং যখনই সুযোগ পায়, ব্যয় করে দেয়। এতে সে প্রতিপত্তি ও খ্যাতির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনের হক আদায় করাই তার লক্ষ্য থাকে। এরূপ ধনী নিঃসন্দেহে সবরকারী ফকীর অপেক্ষা উত্তম।

সবর ও শোকর শব্দদ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য আমল ও হাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ উপর্যুপরি আসার কারণে বান্দার লজ্জিত হওয়া, নিজেকে শোকর আদায়ে অসমর্থ মনে করা, আল্লাহর সহনশীলতাকে উপলব্ধি করা, এ কথা স্বীকার করা যে, কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি আসে, নেয়ামত পেয়ে বিনয় ও নম্রতা করা—এ সমস্ত বিষয় পৃথক পৃথক শোকর। যে ব্যক্তি নেয়ামতের মাধ্যম হয়, তার শোকর করাও আল্লাহর শোকরের নামান্তর। যেমন হাদীসে আছে— مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকর করে না।

অনুরূপভাবে নেয়ামতদাতার সামনে আদবসহকারে থাকাও শোকর এবং নেয়ামতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শোকর। অতএব, বিশেষ প্রকারের শোকর ও সবর উদ্দেশ্য না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর একটিকে অপরটির উপর মোটামুটিভাবে কেমন করে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে?

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন—আমি এক সফরে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ যৌবনের শুরুতে আমি আমার চাচাত বোনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলাম। সেও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। অবশেষে তার বিবাহ আমার সাথেই সম্পন্ন হল। বাসর রাতে আমি তাকে বললাম ঃ এসো, এ রাত্রি আমরা শোকরানার নফল নামায পড়ে কাটিয়ে দেই। আল্লাহ আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, এজন্যে তাঁর শোকর করা দরকার। সেমতে আমরা উভয়েই সে রাত্রি নামাযে কাটিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় রাত্রিতেও আমরা আগের রাত্রির মত কথাবার্তা বললাম এবং সারারাত শোকরগুযারীতে কাটিয়ে দিলাম। এরপর আমার বয়সের আশি বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা অদ্যাবধি সেই শোকরগুযারীর হালেই আছি। আমাদের মধুমিলন সম্ভব হয়নি। আমি ঘটনা সত্য কি না, বৃদ্ধাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা বলল ঃ বাস্তব ঘটনা তাই, যা আমার স্বামী বলেছে।

এখন লক্ষণীয় যে, যদি তাদের বিবাহ না হত এবং বিরহে সবর করতে হত, তবে তাদের সবরকে তাদের এই শোকরের সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে, এই শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। মোটকথা, জটিল বিষয়াদির স্বরূপ সবিস্তার বর্ণনা ছাড়া উদঘাটিত হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খওফ ও রিজা

(ভয় ও আশা)

জানা উচিত যে, খওফ ও রিজা দুটি পাখা, যাতে ভর করে নৈকট্যশীল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মকাম পর্যন্ত উড্ডয়ন করে, অথবা এগুলোকে সওয়ারী বলা যায়, যাতে সওয়ার হলে আখেরাতের প্রতিটি দুর্গম পথ অবিক্রান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আল্লার নৈকট্য, চিরন্তন সুখ-শান্তি এবং খোদায়ী সন্তুষ্টির সুশোভিত উদ্যান অনেক দূর-দূরান্তে অবস্থিত এবং অপ্রিয় কর্ম ও শারীরিক মেহনত দ্বারা আবৃত। "রিজা" তথা আশার আলোকবর্তিকা ছাড়া কারও পক্ষে সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে জাহান্নামের অগ্নিশিখা সূক্ষ্ম কাম-প্রবৃত্তি এবং অদ্ভুত আনন্দ ও ভোগের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। "খওফ" তথা ভয়ের চাবুক ছাড়া কেউ এ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়। তাই খওফ ও রিজার স্বরূপ এবং পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর সমন্বয়ের পন্থা বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিজা

রিজা হচ্ছে অধ্যাত্মপথের পথিক ও সাধকগণের অন্যতম মকাম ও হাল। মকাম ও হালের পার্থক্য এই, যখন কোন গুণ সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কায়েম ও স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তাকে মকাম বলা হয়। আর যদি কোন গুণ অর্জিত হওয়ার পর স্থায়ী না হয় এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, তবে তাকে হাল বলা হয়। অন্তরের এ অবস্থাটি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান।

রিজার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে—এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কেবল হালকেই রিজা বলা হয়। এর ব্যাখ্যা এই, মানুষের প্রিয় অথবা অপ্রিয়বস্তু অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যত— এই তিন কালের মধ্য থেকে কোন না কোন এক কালে অস্তিত্ব লাভ করবে। যদি অতীত কালে অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোন বস্তুর ধ্যান অন্তরে আসে, তবে তাকে "যিকর ও তাযাক্কুর" (স্মরণ করা) বলা হয়। অন্তরে আসা বস্তু যদি বর্তমান কালে বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে "ওজদ" (বিভুচিন্তায় মূর্ছাগত হওয়া) ও "খওফ" ভয় বলা হয়। আর যদি অন্তরে কোন বস্তুর শংকা ভবিষ্যত কালে হয় এবং তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তার নাম হয় "ইন্তেযার" ও "তাওয়াক্কু" (অপেক্ষা ও আশা)। যে বস্তুর অপেক্ষা করা হয়, তা যদি অশুভ হয় এবং মানসিক ব্যথার কারণ হয়, তবে তাকে বলা হয় "খওফ" (ভয়)। পক্ষান্তরে যদি সেই বস্তু প্রিয়, সুখকর ও আনন্দদায়ক হয়, তবে এই সুখ অর্জন করাকে বলা হয় "রিজা"। অতএব, রিজার সংজ্ঞা হচ্ছে, যে বস্তু আন্তরিকভাবে প্রিয়, তার অপেক্ষায় অন্তরের আনন্দিত হওয়া।

বলা বাহুল্য, প্রিয় বস্তুর আশা করার কিছু কারণও থাকবে। যদি এ কারণে আশা করে যে, তার কাছে তার অধিকাংশ উপকরণ মওজুদ আছে,

তবে এরূপ আশা করাকে রিজা বলা সঠিক। আর যদি উপকরণ কিছু না থাকে অথবা অকেজো উপকরণ থাকে, তবে এ আশাকে ধোকা ও বোকামি বলাই উচিত। যদি উপকরণের অস্তিত্ব জানা না থাকে এবং উপকরণ না থাকার বিষয়টিও জানা না থাকে, তবে এরূপ আশা ও অপেক্ষাকে "তামান্না" বলা হয়। মোটকথা, যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয়, এমন বিষয়ের জন্যে রিজা প্রযোজ্য হয়। আর যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত, তার বেলায় রিজা প্রয়োগ করা হয় না। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের সময় আমরা বলি না যে, আমরা সূর্যোদয়ের রিজা তথা আশা করছি এবং সূর্যাস্তের সময় বলি না যে, আমরা সূর্য ডুবে যাবে বলে খওফ তথা আশংকা করছি। কেননা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিশ্চিত বিষয়। হাঁ, এটা বলা যায় যে, বৃষ্টি বর্ষণের আশা করা যায় এবং খরার আশংকা আছে।

অধ্যাত্মবিদদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, অন্তর মৃত্তিকাসদৃশ, ঈমান যেন বীজ এবং ইবাদত ও সৎকর্ম হালচাষ করা ও খাল কেটে পানি সেচনের ব্যবস্থা করার ন্যায়। লোভী ও দুনিয়ায় নিমজ্জিত অন্তর লবণাক্ত ভূমির ন্যায়, যাতে বীজ গজায় না। আখেরাত হচ্ছে শস্য কাটার দিন। দুনিয়াতে যে যা কিছু বপন করবে, আখেরাতে সে তাই কাটবে। লবণাক্ত ভূমিতে যেমন বীজের ফলন হয় না, তেমনি অন্তরে ভ্রষ্টতা ও অসচ্চরিত্রতার উপস্থিতিতে ঈমানরূপী বীজ কমই ফলপ্রসূ হয়। যে বান্দা মাগফেরাতের আশা করে, তার অবস্থা ক্ষেতের মালিকের মতই মনে করা উচিত। যদি কোন কৃষক উর্বর ভূমি বেছে নেয়, তাতে পয়লা নম্বরের বীজ বপন করে, সময়মত পানি দেয় এবং আগাছা, কাঁটা ইত্যাদি বেছে দেয়, এরপর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীর আশা করে, তবে তার এই আশাকে রিজা বলা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করার পর তার কোন খবর না নেয় এবং ঘরে বসে শস্য পাওয়ার অপেক্ষা করে, তবে তার এই অপেক্ষাকে রিজা বলা হবে না; বরং নির্বুদ্ধিতাই বলা হবে। এ থেকে জানা গেল যে, রিজা কেবল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপেক্ষাকে বলা হয়, যাতে বান্দার এখতিয়ারাধীন সকল উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়ে যায়, কেবল তাই বাকী থাকে, যা তাঁর এখতিয়ারাধীন নয়।

অনুরূপভাবে বান্দা যদি অন্তরের শস্যক্ষেত্রে ঈমানের বীজ বপন করে, একে ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন করে, অসচ্চরিত্রতার আগাছা ও কাঁটা থেকে পরিষ্কার রাখে, এরপর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মঙ্গলজনক জীবনাবসানের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষাকে সত্যিকার রিজা বলা হবে। এ রিজার জন্যে ঈমানের যে সকল উপায়-উপকরণ দ্বারা মাগফেরাত পূর্ণতা লাভ করে, সেগুলো আমৃত্যু পালন করে যাওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ঈমানের বীজ বপন করার পর কোন খবর না নেয়, ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন না করে, অন্তর কুস্বভাব দ্বারা পরিপূর্ণ রাখে, পার্থিব আনন্দ-উল্লাসের অন্বেষণে নিমজ্জিত থাকে, এরপর মাগফেরাতের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষা বোকামি ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله

অর্থাৎ, বোকা সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আপন খেয়াল-খুশীর অনুগামী করে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের বাসনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا -

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে এমন অপদার্থরা আগমন করল, যারা নামাযকে বরবাদ করে দিল এবং কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তারা লাভ করবে পথভ্রষ্টতা।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا -

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে আল্লাহর কিতাবের নালায়েক উত্তরাধিকারীরা আসল। তারা এই হীন জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করত এবং বলত, আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

কোরআন পাকে উদ্যানের মালিকের নিন্দায় বলা হয়েছে যে, সে যখন উদ্যানে গমন করল, তখন বলল ঃ

ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لاجدن خيرا منها منقلبا -

অর্থাৎ, আমার মনে হয় না যে, এই উদ্যান কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত কায়েম হবে। যদি আমি রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে আমি সেখানে এর চেয়ে উত্তম বস্তু পাব।

মোটকথা, যে বান্দা এবাদত ও আনুগত্যে সচেষ্ট হয় এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে, সে আল্লাহর কাছে নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার আশা করার যোগ্য। কিন্তু গোনাহগার যদি তওবা করে এবং কৃত ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, তবে তওবা কবুল হওয়ার আশা করা তার জন্যে শোভনীয়। কারণাদি পোক্তা হলেই রিজা তথা আশা হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করতে পারে।

এর অর্থ এই, তারাই রহমত আশা করার যোগ্য। এই অর্থ নয় যে, আশা কেবল তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। কেননা, আশা অন্যরাও করে, যাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী নেই।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমার মতে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা

হচ্ছে মাফ হওয়ার আশায় অনুতাপ ছাড়াই একের পর এক গোনাহ্ করে যাওয়া, এবাদত না করেই খোদায়ী নৈকট্য আশা করা, অগ্নির বীজ বপন করে জান্নাতের প্রতীক্ষা করা, গোনাহের বিনিময়ে আনুগত্যশীলদের মকাম অন্বেষণ করা এবং আমল ছাড়াই সওয়াবের প্রত্যাশা করা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, রিজা এলমের এমন একটি অবস্থা, যা অধিকাংশ উপকরণ অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা দাবী করে যে, অবশিষ্ট উপকরণগুলো অর্জন করার ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণতঃ উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যার বীজ ভাল হবে, ভূমিও উর্বর হবে এবং পানিও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, তার রিজা সাচ্চা হবে। এই রিজা তাকে ক্ষেতের খবরদারী করতে, আগাছা পরিষ্কার করতে, পরিচর্যায় অলসতা না করতে এবং শস্য কাটার সময় পর্যন্ত দেখা-শুনা অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর কারণ এই যে, রিজার বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যে এই দেখা-শুনা হতে পারে না। উদাহরণতঃ যে জানে যে, তার ভূমি লবণাক্ত, পানি পৌঁছানোও সুকঠিন এবং বীজ কখনও অংকুরিত হবে না, সে কখনও চাষাবাদে সম্মত হবে না এবং দেখা-শুনার কষ্টও সহ্য করবে না। নৈরাশ্য আমল থেকে বিরত রাখে এবং রিজা আমলে উৎসাহিত করে। রিজাকারী রিজার ফলশ্রুতিতে সর্বদা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকার মধ্যে আনন্দ পায়, মোনাজাতে স্বস্তি পায় এবং নম্রতা সহকারে আল্লাহর খোশামোদ করতে থাকে। এসব বিষয় সেই ব্যক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায়, যে দুনিয়াতে কোন বাদশাহের কাছে রিজা করে। অতএব, সত্যিকার বাদশাহ্ আল্লাহর কাছে রিজা রাখার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কেন? যদি প্রকাশ না পায়, তবে বুঝতে হবে যে, এই ব্যক্তি রিজার মকাম থেকে এখনও বঞ্চিত এবং প্রতারণার গর্তে পতিত।

হযরত যায়দ খায়ল বর্ণনা করেন; আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম—আমি জানতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তার মধ্যে এর কি পরিচয় রাখেন এবং যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আলামত কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার অবস্থা কি? আমি আরয করলাম ঃ আমার অবস্থা এই যে, আমি সৎকর্ম-পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসি। যখন কোন সৎকর্ম করতে সক্ষম হই,

তখন যথাশীঘ্র তা সম্পাদন করে ফেলি এবং এর সওয়াবের বিশ্বাস রাখি। কোন সৎকাজের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলে তজ্জন্যে দুঃখ করি এবং তার আগ্রহ রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ এটাই সেই ব্যক্তির পরিচয়, যার কল্যাণ আল্লাহ তা'আলা করতে চান। আল্লাহ তোমার জন্যে অন্য কিছু চাইলে তার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করতেন এবং তুমি কোন্ বনে হারিয়ে গেছ, তার কোন পরওয়া করতেন না। এই হাদীসে সৎলোকদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করে, অথচ তার মধ্যে এসব আলামত নেই, সে প্রতারিত।

রিজার ফযীলত ঃ রিজা সহকারে আমল করা খওফ সহকারে আমল করার চেয়ে উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, সেই বান্দাই আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়, যে আল্লাহর সাথে সর্বাধিক মহব্বত রাখে। বলা বাহুল্য, রিজা দ্বারা মহব্বত বেশী হয়। উদাহরণতঃ দু'জন বাদশাহের মধ্যে মানুষ একজনের সেবা তার ভয়ে করে এবং অপরজনের সেবা তার অনুগ্রহ লাভের আশায় করে। এমতাবস্থায় শেষোক্ত বাদশাহের প্রতিই মহব্বত বেশী হবে। এ কারণেই শরীয়তে রিজা সম্পর্কে বিশেষত মৃত্যুর সময় অনেক উৎসাহবাণী বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

এখানে নৈরাশ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর হযরত এয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন—তুমি জান আমি তোমার মধ্যে ও ইউসুফের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর কেন খাড়া করেছি? এর কারণ এই যে, তুমি বলেছিলে—

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় যে, তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে।

তুমি বাঘের ভয় করলে কেন? আমার কাছে রিজা করলে না কেন?

তুমি ইউসুফ ভ্রাতাদের অসাবধানতার প্রতি নযর দিয়েছ এবং আমার হেফাযতের কথা ভেবে দেখনি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ, তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, সে যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণাই রাখে।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ فَلْيَظُنَّ بِىْ مَاشَاءَ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে থাকি। অতএব, সে আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ধারণা রাখুক।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছে তার অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় গমন করলেন এবং বললেন ঃ এখন তোমার অবস্থা কি? সে আরয করল ঃ আপন গোনাহের জন্যে ভয় করি এবং আল্লাহর রহমতের আশা করি। তিনি বললেন ঃ এ সময়ে যে বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় (আশা ও ভয়) একত্রিত থাকে, আল্লাহ তাকে তার ঈপ্সিত বস্তু দান করেন এবং যে বিষয়কে সে ভয় করে, তা থেকে নিরাপদে রাখেন।

জনৈক ব্যক্তি অনেক গোনাহের ভয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তোমার এই নিরাশ হওয়াটা তোমার সকল গোনাহের চেয়ে বড় গোনাহ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর ক্ষমতা দিয়েছেন, অতঃপর সে মার্জনার আশা রাখে, আল্লাহ তাকে মার্জনা করবেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের দোষ এভাবে বর্ণনা করেছেন—

ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি যে ধারণা রাখতে, সেই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে।

আরও বলা হয়েছে—

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا

অর্থাৎ, তোমরা খারাপ ধারণা করলে। বস্তুত তোমরা ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায় ছিলে।

হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ এর কি কারণ ছিল যে, তুমি মন্দ কাজ দেখে নিষেধ করনি? তখন যদি আল্লাহ তাকে সঠিক জওয়াবের তাওফীক দেন, তবে সে বলবে—ইলাহী! আমি তোমার কাছে রিজা এবং মানুষকে খওফ করেছিলাম। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ আমি তোমার অপরাধ মাফ করলাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে— যা কখনও বিপর্যস্ত হবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বললেন ঃ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, ক্রন্দন করতে বেশী, বনে-জঙ্গলে বুকে করাঘাত করে ফিরতে এবং আপন রবের দরবারে চীৎকার করতে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে কেন? অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে রিজা ও আগ্রহের কথাবার্তা বললেন।

আব্বান ইবনে আবী আইয়াশ অধিকাংশ সময় মানুষকে আশার বাণী শুনাতেন। তাকে মৃত্যুর পর লোকেরা স্বপ্নে দেখল যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে নিজের সাথে খাড়া করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এ ধরনের কথাবার্তা কেন বলতে? আমি আরয করলাম ঃ আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে দেই। তখন আল্লাহ বললেন ঃ যাও

আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এক হাদীসে আছে—বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মানুষকে নিরাশ করত এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন—তুই যেমন আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করেছিস, তেমনি আমি তোকে আজ আমার রহমত থেকে নিরাশ করব।

রিজা লাভের উপায় ঃ রিজার প্রয়োজন দু'ব্যক্তির। এক, যার উপর নৈরাশ্য প্রবল, ফলে সে এবাদত বর্জন করে বসে আছে। দ্বিতীয়, যার উপর খওফ তথা ভয় প্রবল, ফলে, সে এবাদতে বাড়াবাড়ি করে নিজের ও গৃহবাসীদের ক্ষতি করে। এই উভয় ব্যক্তি সমতার সীমা অতিক্রম করে স্বল্পতা ও বাহুল্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাদের এমন চিকিৎসার প্রয়োজন, যা দ্বারা তারা সমতার সীমায় ফিরে আসে।

কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয়ে গোনাহেই ডুবে থাকে, তার জন্যে রিজা বিষতুল্য। এরূপ প্রতারিত ব্যক্তির জন্যে ভয় ও ভয় উৎপাদনকারী বিষয়সমূহ ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই। অতএব, যারা মানুষের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করে, তাদের উচিত রোগের কারণ জেনেশুনে উপযুক্ত চিকিৎসা করা। তারা যেন এরূপ চিকিৎসা না করে, যা দ্বারা রোগ আরও বেড়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে এবং আযাব থেকে নির্ভীক না বানায়। আমরা রিজার যে সকল উপকরণাদি বর্ণনা করি, সেগুলো নিরাশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্যে বর্ণনা করি অথবা এমন ব্যক্তির জন্যে, যার উপর ভয় প্রবল। কোরআন পাক ও হাদীস শরীফও তাই দাবী করে। কেননা, উভয়ের মধ্যে খওফ ও রিজা পাশাপাশি দেখা যায়। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে সকল প্রকার রোগীদের আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে, যাতে পয়গম্বরগণের ওয়ারিস আলেমগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করে, যেমন বিচক্ষণ চিকিৎসক করে থাকে এবং বোকাদের মত চিকিৎসা না করে। বোকারা এই ধারণায় লিপ্ত যে, প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেক রোগের উপযোগী।

রিজা প্রবল করার উপায়সমূহের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে এরূপ—চিন্তা

করা যে, দুনিয়াতে মানুষের টিকে থাকার জন্যে যে সকল বস্তু জরুরী ছিল, সেগুলো সব আল্লাহ তা'আলা সরবরাহ করেছেন, যেমন খাওয়ার যন্ত্রপাতি, কাজ করার হাতিয়ার, যেমন অঙ্গুলি, নখ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি সাজসজ্জার সামগ্রীও দান করেছেন, যেমন ভ্রূ বক্র করেছেন, চোখে কয়েক প্রকার রঙ দিয়েছেন এবং ওষ্ঠ লাল করেছেন। এসব বস্তু না থাকলেও মানবিক উদ্দেশ্যে কোন ত্রুটি দেখ দিত না— কেবল সৌন্দর্য বিনষ্ট হত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষ এগুলোও লাভ করেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদের প্রতি এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুগ্রহ দানেও ত্রুটি করেননি এবং বাড়তি সাজসজ্জা, প্রয়োজন ও স্থায়িত্বের বস্তুসমূহ তাদের হাতছাড়া হতে দেননি, তখন তিনি তাদেরকে চিরন্তন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে সম্মত হবেন কেমন করে?

রিজা প্রবল করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে রিজা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও বুযুর্গদের উক্তিসমূহ তালাশ করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে অনেক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

অর্থাৎ, বলে দিন হে আমার সে সকল বান্দা, যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ -

অর্থাৎ, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে রয়েছে, তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, তিনি দোযখকে দুশমনদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন

এবং এর মাধ্যমে নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন। সেমতে বলা হয়েছে—

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ـ

অর্থাৎ, তাদের জন্যে রয়েছে উপরের দিক থেকে আগুনের ছায়া এবং নিচের দিক থেকে আগুনের তাপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন।

আরও বলা হয়েছে—

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ, সে আগুনকে ভয় কর, যা তৈরি হয়েছে কাফেরদের জন্যে।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَايَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে একটি জ্বলন্ত আগুনের খবর শুনিয়ে দিলাম। এতে চরম হতভাগ্যই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

فَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদের জন্যে ক্ষমাশীল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা উম্মতের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতেন। অবশেষে তাঁর প্রতি উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় এখনও কি আপনি সন্তুষ্ট নন?

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও দোযখে থাকে, তবে আমি সন্তুষ্ট হব না।

হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন ঃ তোমরা ইরাকবাসীরা

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

আয়াতখানিকে কোরআন মজীদের সর্ববৃহৎ আশার আয়াত বলে থাক, আর আমরা নবী পরিবারের লোকজন এ আয়াতকে সর্বাধিক আশার আয়াত বলে থাকি— وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ الخ

রিজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু মূসার বর্ণনায় রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। আখেরাতে এই উম্মতকে আযাব দেয়া হবে না। তাদের কুকর্মের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই ভূমিকম্প ও অন্যান্য আপদ দ্বারা দিয়ে দেন। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি কিতাবধারীদের মধ্য থেকে একজনকে পাবে। বলা হবে, তোমার জন্যে দোযখের অগ্নির "ফেদিয়া" (বিনিময়) এই ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে এভাবে বলা হয়েছে—এই উম্মতের প্রত্যেকেই ইহুদী ও খৃস্টানকে আনবে এবং বলবে দোযখের অগ্নির জন্যে এই ব্যক্তি আমার বিনিময়। এরপর সে ইহুদী ও খৃস্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

وَالْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِىَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ বিশেষ। এটা জাহান্নাম থেকে মুমিনের অংশ।

يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ـ

অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ নবী ও তাঁর সাথে মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন যে, এই উম্মতের হিসাব আমি আপনার হাতে সোপর্দ করছি। নবী (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, এরূপ করবেন না। আমার তুলনায় আপনিই তাদের জন্যে উত্তম। আদেশ হল ঃ এখন আমি তাদের ব্যাপারে আপনাকে লাঞ্ছিত করব না।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানালেন যে, আমার উম্মতের গোনাহসমূহের হিসাব আমার কাছে সোপর্দ করুন, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আমাকে ছাড়া কেউ অবহিত না হয়। প্রত্যুত্তরে বলা হল ঃ তারা আপনার তো কেবল উম্মত, কিন্তু আমার বান্দা। আমি তাদের প্রতি আপনার তুলনায় অধিক মেহেরবান। অতএব, তাদের হিসাব আমার ছাড়া কারও হাতে দেব না, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আপনিও অবগত না হোন এবং অন্য কোন ব্যক্তি জানতে না পারে। সোবহানাল্লাহ।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের জন্য উত্তম। জীবদ্দশায় আমি তোমাদের জন্যে শরীয়তের পথ উদঘাটিত করি, আর আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমাদের উত্তম আমলসমূহের জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করব এবং মন্দ আমলসমূহের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব।

এক হাদীসে আছে— যখন বান্দা কোন গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ দেখ আমার বান্দা গোনাহ করেছে, এরপর ভেবেছে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি গোনাহ মাফ করেন এবং শাস্তিও দেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

এক হাদীসে কুদসীতে আছে—বান্দার গোনাহ যদি আকাশচুম্বীও হয়, তবে যতক্ষণ সে ক্ষমা চাইবে এবং আমার কাছে রিজা রাখবে, আমি ক্ষমা করে দেব। এক হাদীসে আছে, যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ফেরেশতা তা আমলনামায় লেখে না। এই সময়ের মধ্যে যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করে নেয়, তবে সে গোনাহ লেখাই হয় না। নতুবা একটি পাপ লিখে নেয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন —যখন বান্দা গোনাহ করে, তখন তা তার আমলনামায় লেখা হয়। জনৈক বেদুইন বলল ঃ যদি সে তওবা করে? তিনি বললেন ঃ তবে মিটিয়ে ফেলা হয়। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ যদি পুনরায় গোনাহ্ করে? তিনি বললেন ঃ তবে তার আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। বেদুইন আরয করল ঃ যদি সে তওবা করে নেয়? তিনি বললেন ঃ তবে আমলনামা থেকে আবার মিটিয়ে

ফেলা হয়। বেদুইন বলল ঃ এটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ সে তওবা করতে থাকবে। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনায় ক্লান্ত না হয়, আল্লাহ সে পর্যন্ত ক্ষমা করার কাজে অস্থির হন না। এরপর যখন বান্দা পুণ্যকাজের ইচ্ছা করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা তা বাস্তবায়নের পূর্বেই একটি পুণ্য লিখে নেয়। যদি সে ইচ্ছার পর তা বাস্তবায়নও করে, তবে সেই ফেরেশতা দশটি পুণ্য লিখে নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন মানুষ গোনাহ করার ইচ্ছা করে, তখন বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত কিছুই লেখা হয় না। বাস্তবায়ন করলে একটি পাপই লেখা হয়। অতঃপর আল্লাহর কৃপায় তা মাফও হয়ে যেতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলতে লাগল ঃ আমি এক মাসের বেশী রোযা রাখি না এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত নামায পড়ি না। আমার ধন-সম্পদে সদকা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কিছুই ফরয নয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পর আমি কোথায় থাকব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জান্নাতে। লোকটি আরয করল ঃ আপনার সাথে? তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ হাঁ, আমার সাথে এই শর্তে যে, তুমি অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে হেফাযতে রাখবে, জিহ্বাকে গীবত ও মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং চক্ষুকেও দুটি বিষয় থেকে বিরত রাখবে। এক, আল্লাহর হারাম করা বস্তুসমূহ দর্শন এবং দুই, কোন মুসলমানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা। যদি এ সব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, তবে আমার সাথে একত্রে এবং আমার এই দু' হাতের তালুতে তুমি জান্নাতে যাবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে গৌরব ও মাহাত্ম্য দান করেছেন। যদি কেউ এর এক একটি পাথর আলাদা করে দেয়, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়, তবে ততটুকু গোনাহ হবে না, যতটুকু আল্লাহর একজন ওলীকে হেয় করার কারণে হয়। প্রশ্ন হল—আল্লাহর ওলী কারা? তিনি বললেন ঃ ঈমানদার সকলেই আল্লাহর ওলী। তুমি কি আল্লাহর এই উক্তি শুননি?

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ, আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় কিয়ামতের ভূকম্পন একটি মহা ঘটনা।

অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান এটা কোন্ দিন? এটা সেই দিন, যখন আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হবে—দাঁড়াও এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে দোযখের রসদ বের কর। তিনি আরয করবেন ঃ কি পরিমাণ বের করব? নির্দেশ হবে—এক হাজারের মধ্য থেকে একজনকে জান্নাতের জন্যে এবং অবশিষ্ট নয়শ' নিরানব্বই জনকে দোযখের জন্যে বের কর। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে গেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করলেন। সেদিন কোন কাজেই তাদের মন বসল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা কাজ করছ না কেন? তারা বললেন ঃ আপনার মুখে সেই হাদীস শোনার পর কাজ করার সাধ্য কারও নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অন্যান্য কওমের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা কত, তা বোধ হয় তোমাদের জানা নেই। কওম তো এত বেশী, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাদের সামনে তোমাদের কোন গণনাই হতে পারে না। তাদের সকলের তুলনায় তোমরা যেন কাল বলদের চামড়ায় একটি সাদা চুল কিংবা ঘোড়ার পায়ে অন্য রঙের চিহ্ন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে খওফের চাবুক দিয়ে কিভাবে হাঁকাতেন এবং তারপর রিজার লাগাম টেনে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে নিয়ে আসতেন। তিনি প্রথমে ভয়ের চাবুক দিয়ে হাঁকিয়েছেন; কিন্তু যখন জানতে পারলেন, ভয়ের আতিশয্য তাদেরকে সীমার বাইরে নিয়ে গেছে এবং তারা নৈরাশ্যের গহ্বরে পড়ে গেছেন, তখন অনতিবিলম্বে আশার ঔষধি প্রয়োগ করে তাদের চিকিৎসা করলেন।

এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা অন্য লোক সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহ করবে এবং ক্ষমা পাবে। কেননা, তাঁর সত্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি এমন বিষয়ের আশংকা করি, যা গোনাহের চেয়েও মারাত্মক। প্রশ্ন হল ঃ সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন ঃ আত্মম্ভরিতা। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা তাঁর একশ' রহমতের মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখেছেন এবং একটি মাত্র রহমত দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন। এই এক রহমতের কারণেই সমগ্র মানবজাতি একে অপরের প্রতি রহম করে। জননী তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদের আদর করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এই এক রহমতকে সেই নিরানব্বই রহমতের সাথে যোগ করে সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক রহমত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমপরিমাণ হবে। এহেন রহমতের উপস্থিতিতে সেদিন নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা দোযখ থেকে পরিত্রাণ দেবে। (অর্থাৎ রহমত ছাড়া আমল কোন উপকারী হবে না।) লোকেরা আরয করল ঃ আপনিও কি তেমনি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমার অবস্থাও তদ্রূপ যে পর্যন্ত আল্লাহর রহমত আমাকে আবৃত করে না নেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আমি আমার শাফায়াত উম্মতের গোনাহের জন্যে গোপন রেখেছি। শাফায়াত কেবল মুত্তাকী ও আনুগত্যশীলদের জন্যেই নয়; বরং গোনাহগারদের জন্যেও।

এখন রিজা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি শোনা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গোনাহ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে গোপন রাখেন, তাঁর কৃপা এটা চায় না যে, তার গোনাহের পর্দা আখেরাতে খুলে দেবেন। আর যে ব্যক্তি গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আল্লাহর সুবিচার এটা চায় না যে, আখেরাতে পুনরায় সে শাস্তি ভোগ করুক। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ আমার হিসাব যদি আমার পিতা-মাতার হাতেই সমর্পণ করা হয়, তবু আমি ভাল মনে করি না। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি পিতামাতার চেয়েও অধিক মেহেরবান। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদার যখন অবাধ্যতা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ ফেরেশতাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দেন, যাতে তারা অপরাধ দেখে সাক্ষী না হয়ে যায়।

মোহাম্মদ ইবনে মুসয়্যিব এক পত্রে আসওয়াদ ইবনে সালেমকে লিখেন—যখন বান্দা নিজের প্রতি যুলুম করে, এরপর "ইয়া রব" বলে হাত উঠায়, তখন ফেরেশতারা তার আওয়াজ ফিরিয়ে রাখে। দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার তাই করে। এরপর বান্দা যখন চতুর্থ বার "ইয়া রব" বলে ডাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ফেরেশতাগণ, আমার বান্দার আওয়াজ আমার কাছে কতক্ষণ গোপন রাখবে? আমার বান্দা জেনে নিয়েছে যে, তার জন্যে আমার ছাড়া কোন পরওয়ারদেগার নেই, যে গোনাহ মাফ করতে পারে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে একা একা কা'বা গৃহের তওয়াফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রাত্রিটি ছিল অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন। আমি মুলতাযামে কা'বার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বললাম ঃ ইলাহী, আমাকে গোনাহ থেকে হেফাযতে রাখ। আমি কখনও যেন তোমার নাফরমানী না করি। তৎক্ষণাৎ এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—হে ইবরাহীম, তুমি আমার কাছে নিষ্পাপতার প্রার্থনা করছ। ঈমানদার মাত্রই এটা চায়। কিন্তু আমি যদি সবাইকে নিষ্পাপ করে দেই, তবে আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা কার জন্যে থাকবে? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ ঈমানদার যদি গোনাহ না করে, তবে অদৃশ্য জগত ও আসমানী রহস্যসমূহের মধ্যে উড়ে ফিরবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা গোনাহের কারণে তার পাখা ছিঁড়ে দিয়েছেন।

হাদীসে এয়ামনে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ভাই ভাই ছিল। তাদের একজন গোনাহগার, অপরজন আবেদ। আবেদ সর্বদা গোনাহগার ভাইকে উপদেশ দিত ও তিরস্কার করত। সে উত্তরে বলত—আমি জানি আর আমার পরওয়ারদেগার জানে। তুমি আমার উপর দারোগা নিযুক্ত হওনি। একদিন আবেদ তাকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে ফেলল। আবেদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আল্লাহ তোকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই গোনাহগারকে কিয়ামতের দিন বলবেন— কারও সাধ্য নেই যে, আমার রহমত আমার বান্দা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যা, আমি তোকে ক্ষমা করলাম। আর আবেদকে বলবেন—তোর জন্যে আমি দোযখ অপরিহার্য করে দিলাম।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এই আবেদ এমন কথা বলল, যা দ্বারা তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হয়ে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে মুশরিকদের জন্যে বদদোয়া করতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আপনার কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাদেরকে তওবার ক্ষমতা দেবেন,অথবা শাস্তি দেবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোয়া পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তাদের অধিকাংশকে ইসলাম গ্রহণে ধন্য করলেন।

বর্ণিত আছে, দুই আবেদ ব্যক্তি এবাদতে সমান সমান ছিল। যখন তারা জান্নাতে গেল, তখন একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চ মর্তবা পেল। যার মর্তবা কম ছিল, সে আরয করল ঃ ইলাহী, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী এবাদত করত না। কিন্তু তুমি তাকে উচ্চ মর্তবা দান করেছ। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ দুনিয়াতে থাকাকালে সে আমার কাছে উচ্চ মর্তবার আবেদন করত। আর তুমি কেবল জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দোয়া করতে। আমি প্রত্যেককে তার আবেদন অনুযায়ী দান করেছি।

এ থেকে জানা গেল যে, রিজা সহকারে এবাদত করা উত্তম। কেননা, যে রিজা করে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল থাকে। এদিকে লক্ষ্য করেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় বড় মর্তবা তলব কর। তোমরা এমন দাতার কাছে যাও, যার জন্যে দান করা মোটেই কঠিন নয়। তিনি আরও বলেন ঃ যখন আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাও, তখন সাগ্রহে চাও এবং উচ্চতম ফেরদাউসের দরখাস্ত কর। কেননা, তার কাছে কোন বস্তুই বড় নয়, যা তিনি দিতে পারেন না।

বর্ণিত আছে, জনৈক উগ্নি-উপাসক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে আতিথেয়তা চাইলে তিনি বললেন ঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেলে আমি তোমার আতিথেয়তা করব। এতে অগ্নি-উপাসক চলে গেল। আল্লাহ

তা'আলা তৎক্ষণাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন—তুমি ধর্মের বিভিন্নতার কারণে তাকে খেতে দাওনি। আমি সত্তর বছর ধরে কুফর সত্ত্বেও তাকে খাদ্য দিয়ে আসছি। তুমি এক বেলা খাইয়ে দিলে তেমন কি হয়ে যেত? হযরত ইবরাহীম কালবিলম্ব না করে অগ্নিউপাসকের পিছনে ছুটলেন এবং তাকে ফিরিয়ে এনে খাইয়ে দিলেন। অগ্নি-উপাসক জিজ্ঞেস করল ঃ এখন আতিথেয়তার কারণ কি? প্রথমে তো আপনি অস্বীকারই করেছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে অগ্নি-উপাসক বলল ঃ আচ্ছা, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে এমন ব্যবহার করেন! এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবরাহীম আতরোশ বর্ণনা করেন, আমরা কয়েকজন বাগদাদের দজলা নদীর তীরে হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) -এর সাথে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি ডিঙ্গি নৌকায় কয়েকজন যুবক মদ্যপান করে, ঢোল বাজিয়ে নদী বিহারে বের হল। আমরা হযরত মারূফকে বললাম ঃ দেখুন, এরা প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করছে। এদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন, ইলাহী! তুমি তাদেরকে দুনিয়াতে যেমন প্রফুল্ল রেখেছ, আখেরাতে তেমনি প্রফুল্লতা দান কর। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমাদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। আপনি তাদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতে প্রফুল্ল রাখেন, তবে প্রথমে দুনিয়াতে তওবা করার শক্তি দেবেন। অর্থাৎ, তাঁর দোয়ার সারমর্ম এই ছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে এসব কুকর্ম থেকে তওবা নসীব করুন।

উপরোক্ত বিষয়বস্তুগুলোর দ্বারা ভীত ও নিরাশ ব্যক্তিদের অন্তরে রিজা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু নির্বোধ ও আত্মপ্রতারিতদেরকে কখনও এসব কথা শুনাতে নেই। তাদের জন্যে উপযুক্ত বিষয়বস্তু হচ্ছে খওফ, যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। কেননা, অধিকাংশ লোক কেবল খওফ দ্বারাই সংশোধনপ্রাপ্ত হয়; যেমন দুষ্ট বালক বেত্রাঘাত ও কঠোর ভাষা ছাড়া ঠিক পথে আসে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খওফ

খওফ বলা হয় অন্তরের ব্যথা ও অভ্যন্তরীণ জ্বালা-যন্ত্রণাকে, যা ভবিষ্যতের কোন খারাপ আশংকার কারণে সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং যে সর্বদা আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করে, তার ভবিষ্যতের প্রতি মোটেই মনোযোগ থাকে না। ফলে তার ভয় ও আশা কোন কিছুই হয় না। তার অবস্থা এসব বিষয়ের উর্ধ্বে। কেননা, ভয় ও আশা হচ্ছে দুটি লাগাম, যা মনকে তার অহমিকায় যেতে দেয় না। ওয়াসেতী (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন— খওফ আল্লাহ তা'আলার ও বান্দার মাঝখানের একটি যবনিকা। তিনি আরও বলেন ঃ যখন অন্তরে হক প্রবল হয়, তখন তাতে খওফ ও রিজার অবকাশ থাকে না। প্রেমিকের অন্তর যদি প্রেমাস্পদকে দর্শন করার সময় বিরহের ভয়ে মশগুল থাকে, তবে দর্শনে ত্রুটি দেখা দেবে। বরং দর্শন সর্বদা অব্যাহত থাকা চূড়ান্ত মকাম। কিন্তু আমরা এখানে প্রাথমিক মকাম সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে ভয়ও থাকে।

খওফও তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত—এলম, হাল ও আমল। এলম অর্থ সেই কারণের জ্ঞান, যা অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অপরাধ করে বাদশাহের লোকজনের হাতে বন্দী হল। সে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডের খওফ করবে। যদিও ক্ষমা পাওয়া ও পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর, কিন্তু তার অন্তরে খওফ সে পরিমাণে হবে, হত্যার কারণ সম্পর্কে যে পরিমাণ জ্ঞান জোরদার হবে। সে যদি জানে যে, তার অপরাধ গুরুতর কিংবা বাদশাহ অত্যধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ এবং তার নিজের কাছেও মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, তবে নিঃসন্দেহে তার খওফ অধিক জোরদার হবে। পক্ষান্তরে এসব কারণ দুর্বল হলে খওফও দুর্বল হবে। কখনও অপরাধ ছাড়াই খওফ হয়ে থাকে। যেমন, আমরা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুকে খওফ (ভয়) করি। এমনিভাবে আল্লাহ

তা'আলাকে খওফ করা কখনও গোনাহের কারণে এবং কখনও তাঁর মারেফত ও ক্ষমতা জানার কারণে হয়ে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ যা করেন, তার কোন জওয়াবদিহী নেই এবং বান্দাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জওয়াবদিহী করতে হবে। এসব বিষয় মানুষ যত বেশী জানবে, তার খওফও তত বেশী হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে সে-ই বেশী ভয় করবে, যে নিজেকে বেশী জানবে। একারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহর খওফ বেশী করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

এই জ্ঞান পূর্ণ হলে খওফ ও অন্তর্দাহের কারণ হয়। অতঃপর এর প্রভাব অন্তর থেকে দেহে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ফলে, দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মানুষ ক্রন্দন ও আহাজারি করে এবং কখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। খওফ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আনুগত্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে অতীতের ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা অর্জিত হয়। এ কারণেই বলা হয়, সে ব্যক্তি খওফকারী নয়, যে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে চোখ মুছে ফেলে। বরং খওফকারী তাকেই বলা হবে, যে ভয়ের কাজ ত্যাগ করে।

আবুল কাসেম হাকীম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভয় করে, সে তা থেকে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তাঁর দিকেই ছুটে পালায়।

যুন্নুন মিসরীকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দা কখন খওফকারী হয়? তিনি বললেন ঃ যখন নিজেকে রোগীর মত করে নেয়। রোগী রোগ বৃদ্ধির ভয়ে পরহেয করে।

খওফের এক প্রভাব এই যে, এতে খাহেশের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং যাবতীয় আনন্দ বিস্বাদে পরিণত হয়। ফলে, যে গোনাহ প্রিয় ছিল, তা

অপ্রিয় মনে হয়। যেমন মধু পানে আগ্রহী ব্যক্তি যখন শুনে যে, মধুর মধ্যে বিষ রয়েছে, তখন খওফের কারণে আগ্রহ উধাও হয়ে যায়। খওফের কারণে যাবতীয় খাহেশও এমনিভাবে বিলীন হয়ে যায়। অন্তরে বিনয়, নম্রতা ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়। অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। আল্লাহর চিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে কিছু লোকের অবস্থা এমনি ছিল। আল্লাহর মহিমা, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং নিজের দোষত্রুটির মারেফত শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ততটুকুই শক্তিশালী হয়, যতটুকু খওফ শক্তিশালী হয়।

খওফের প্রভাব প্রকাশ হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শরীয়তের হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা। যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে হারাম নয় কিন্তু হারাম হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, সেগুলো থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়া এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের নাম "তাকওয়া"। যদি কেউ শুধু প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করে এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করে। যেমন যে ঘরে থাকে না, সে ঘর নির্মাণও করে না, যে বস্তু খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করে না এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে এই স্তরকে বলা হয় "সিদক" এবং এরূপ ব্যক্তিকে "সিদ্দীক" বলাই শোভনীয়।

কিছু কিছু কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরত থাকা এবং কোন কোন কর্মে তৎপর হওয়ার মাধ্যমেও খওফের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তবে বিশেষ কর্ম থেকে বিরত হওয়াকে শরীয়তে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণতঃ কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় "ইফফত"। এর উপরের স্তরের নাম 'ওরা', যা প্রত্যেক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়। এর উপরের স্তর হচ্ছে তাকওয়া, যা নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত উভয় প্রকার বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে "সিদক ও কুরব"। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে বৈধ বিষয় থেকেও বিরত থাকা। এসব স্তর যেহেতু একটি অপরটির উপরে, তাই সর্বোচ্চ স্তরে নিম্নের সবগুলো স্তরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং এগুলোর শাব্দিক নাম পৃথক পৃথক হলেও অর্থ পৃথক নয়।

খওফের স্তর ঃ খওফ একটি উত্তম বিষয় বিধায় কেউ ধারণা করতে

পারে যে, এটি যত শক্তিশালী ও অধিক হবে, ততই মঙ্গলজনক হবে। এ ধারণা সঠিক নয়। আসলে খওফ একটি চাবুক বিশেষ, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এলম ও আমলের দিকে হাঁকান, যাতে সে নৈকট্যের স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, খওফের কম-বেশী মাত্রা রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী মাত্রাই উত্তম। কম মাত্রার খওফকে মহিলাদের কান্নার মত মনে করা উচিত। তারা যখন কোন কোরআনের আয়াত শুনে অথবা অন্য কোন ভয়াবহ বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন ভয়ে কান্না জুড়ে দেয় এবং অশ্রু মুছতে থাকে। কিন্তু যখনই ভয়ের বিষয়টি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়, তখনই মন পূর্ববৎ গাফেল হয়ে যায়। এ ধরনের খওফ মধ্যবর্তী মাত্রার চেয়ে কম এবং এর উপকারিতাও সামান্য। আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ও আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষের খওফ এমনি ধরনের। এখানে আলেম অর্থ তারা নয়, যারা আলেমদের পোশাক পরিধান করে নামসর্বস্ব পণ্ডিত হয়ে যায়। তারা তো সবার চেয়ে বেশী খওফবিহীন। বরং আলেম বলে আমাদের উদ্দেশ্য তারা, যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নেয়ামতসমূহ এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। এরূপ আলেম বিরল বটে। এ দিক দিয়েই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহকে ভয় কর, তখন জওয়াবে নিশ্চুপ থাক। কেননা, যদি ভয় করি বল, তবে মিথ্যাবাদী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খওফ তাই, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং এবাদত ও আনুগত্যের পাবন্দ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খওফের এই প্রভাব ফুটে না উঠা পর্যন্ত তাকে খওফ না বলে মনের কল্পনা বলাই অধিক সঙ্গত।

মধ্যবর্তী সীমার বেশী খওফ হচ্ছে, খওফ করতে করতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিপতিত হওয়া। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা আমলের পথে প্রতিবন্ধক। মোটকথা, যে খওফ নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, তা নিন্দনীয়। খওফ কোন সময় রোগ, দুর্বলতা, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। এধরনের খওফও নিন্দনীয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিজার উপায়-উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্য মাত্রাতিরিক্ত খওফের প্রতিকার করা।

মোটকথা, খওফ যদি আমলে প্রভাব বিস্তার না করে, তবে তার থাকা না থাকা সমান। আর যদি প্রভাব বিস্তার করে, তবে যে পরিমাণে তার প্রভাব প্রকাশ পাবে, সে পরিমাণেই মর্তবা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণতঃ যদি খওফের কারণে কু-প্রবৃত্তি থেকেই বিরত থাকে, তবে শুধু ইফফতের স্তর অর্জিত হবে। আর যদি খওফ 'ওরা' তথা পরহেযগারীর কারণ হয়, তবে পূর্বের তুলনায় স্তর কিছু বেড়ে যাবে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে সিদ্দীকগণের স্তর। অর্থাৎ, নিজের বাহির ও ভিতরকে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া এবং তাতে অন্যের কোন অবকাশ না থাকা। খওফের এ স্তরটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটা শারীরিক সুস্থতা ও মস্তিষ্কের নিরাপত্তা সহকারে অর্জিত হতে পারে। যদি খওফ এই স্তরকে অতিক্রম করে যায় এবং বুদ্ধি ও সুস্থতা বিনষ্ট করে দেয়, তবে একে রোগ মনে করে জরুরী পর্যায়ে চিকিৎসা করতে হবে। হযরত সহল তস্তরীর কিছু সংখ্যক মুরীদ দীর্ঘদিন উপবাস করত। তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ নিজের মস্তিষ্কের হেফাযত করতে থাকবে। কেননা, আল্লাহর ওলীদের মধ্যে কেউ বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিল না।

খওফের ফযীলত ঃ বলা বাহুল্য, খওফের ফযীলত প্রথমত যৌক্তিক উপায়ে এবং দ্বিতীয়ত কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। যৌক্তিক উপায় এই যে, কোন বস্তুর ফযীলত ততটুকুই হয়, যতটুকু সে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সহায়ক হয়। কেননা, পারলৌকিক সৌভাগ্য ছাড়া মানুষের আর কোন অভীষ্ট নেই। এ সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর দীদার ও তাঁর নৈকট্য অর্জন। অতএব, এই সৌভাগ্য অর্জনে যে বস্তু যে পরিমাণে সাহায্য করবে, সে পরিমাণে তার ফযীলত হবে। এটা জানা কথা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অর্জন করা ছাড়া আখেরাতে তাঁর দীদারের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। মারেফত ছাড়া মহব্বত অর্জিত হয় না এবং মারেফতের জন্যে সার্বক্ষণিক যিকির ও ফিকির অত্যাবশ্যক। আর তা দুনিয়ার মহব্বত মন থেকে আলাদা করা ছাড়া লাভ করা যায় না। পার্থিব মহব্বত মন থেকে আলাদা করতে হলে পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতেই হবে। পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা বর্জন যতটুকু খওফের অনল দ্বারা হতে পারে, অন্য কোন কিছুর দ্বারা ততটুকু হতে পারে না। এতে জানা গেল যে, খওফ এমন একটি অনল, যা দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি

জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি খতম করা, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এবাদত ও আনুগত্যে উৎসাহিত করা যতটুকু কাম্য হবে, ততটুকুই খওফের ফযীলত লাভ হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা খওফের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্নরূপ হতে পারে।

এ ছাড়া খওফ দ্বারা ইফফত, ওরা, তাকওয়া ও মোজাহাদা অর্জিত হয়। এসবগুলোই ফযীলত ও নৈকট্য অর্জনকারী বিষয়। সুতরাং যে খওফ এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ অর্জনের কারণ হয়, তার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত।

খওফের ফযীলত সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত, রহমত, এলম ও রিজা— জান্নাতীদের এই মকাম চতুষ্টয়কে তিনটি আয়াতে খওফকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। খওফের ফযীলতের জন্যে এটাই যথেষ্ট। হেদায়াত ও রহমত এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে—

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

অর্থাৎ, হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্যে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।

এলম সম্বন্ধে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নিম্নোক্ত আয়াতে খওফকারীদের জন্যে রিযার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

এ ছাড়া এলমের ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে, তা দ্বারা খওফের ফযীলতও বুঝা যায়। কেননা, খওফ এলমের ফল। এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, খওফকারীরা "রফীকে

আ'লার" (মহান সঙ্গীর) সাহচর্য লাভ করবে। এতে অন্য কেউ তাদের সাথে শরীক হবে না। এই সাহচর্য বিশেষ ভাবে তাদের জন্যেই নির্ধারিত হওয়ার কারণ এই যে, খওফকারী আলেম হয়ে থাকে। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস বিধায় নবীগণের সাহচর্য আলেমগণই লাভ করবেন। আর নবীগণ ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহান স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করবেন। এ কারণেই ওফাতের পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন দুনিয়াতে থাকার অথবা আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়, তখন তিনি এ কথাই বলতে থাকেন —

أَسْئَلُكَ الرَّفِيْقَ الْأَعْلٰى

আমি "রফীকে আ'লা" তথা মহান সঙ্গীকে চাই।

মূল খওফের দিকে লক্ষ্য করলে এ হালটি হচ্ছে এলম এবং খওফের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে এটি হচ্ছে ওরা ও তাকওয়া। তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। এমনকি, "আকেবাত" তথা পরিণাম তাকওয়ার জন্যেই নির্দিষ্ট। যেমন "হামদ" আল্লাহর জন্যে এবং দুরূদ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট। এমনিভাবে পরিণামও তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, পরিণাম তাকওয়াওয়ালাদের জন্যে এবং দুরূদ মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি।

তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, তাদের গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।

তাকওয়ার অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খওফের ফলে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এর মাহাত্ম্য এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে গোনাহ থেকে বেশী বেঁচে থাকে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ -

অর্থাৎ, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্তদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

আরও বলা হয়েছে—

وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ভয় কর— যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

এ আয়াতে নির্দেশসূচক পদ ব্যবহার করে খওফকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং ঈমানের জন্য এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুমিনকে খওফ থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কমবেশী খওফ অবশ্যই থাকবে। খওফ ততটুকুই দুর্বল হবে, ঈমানে যতটুকু দুর্বলতা থাকবে।

এক হাদীসে আছে اَلْحِكْمَةُ مَخَافَةُ اللّٰهِ অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন — তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে আমার পরে আল্লাহকে খুব ভয় করবে। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে ভয় তার সামনে সর্বপ্রকার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত শিবলী বলেন ঃ যখন আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি, তখন আমার সামনে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভের এক অভূতপূর্ব দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে মুমিন কোন ভুল করে, তার পেছনে দুটি নেকী থাকে। এক, আযাবের খওফ এবং দুই, মাফ হওয়ার আশা। তার ভুলটি খওফ ও রিজার মাঝখানে পড়ে যায়; যেমন দুটো বাঘের মাঝখানে শৃগাল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে আছে—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এরশাদ করবেন, কোন ব্যক্তি হিসাব ছাড়া থাকবে না। তবে যারা ওরা ও তাকওয়াওয়ালা, তাদেরকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করাতে আমি লজ্জাবোধ করি। কারণ, তাদের সম্মান এর চেয়ে ঊর্ধ্বে। বলা বাহুল্য, ওরা ও তাকওয়া শব্দদ্বয়ের অর্থে খওফের শর্ত রয়েছে। খওফ না থাকলে ওরা ও তাকওয়া হবে না।

এমনিভাবে ফযীলতের কতিপয় আয়াতকেও আল্লাহ তা'আলা খওফের সাথে খাস করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ, যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আরও বলা হয়েছে—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি আমার বান্দার উপর দু'খওফ ও দু'শান্তি একত্রিত করব না। যদি সে দুনিয়াতে আমা থেকে নির্ভয় থাকে তবে কিয়ামতে তাকে ভীত করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তবে কিয়ামতে তাকে অভয় দান করব।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَافَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ خَوَّفَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে প্রত্যেক বস্তু ভয় করে। আর যে

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বস্তু থেকে ভীত করেন।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসহায় মানুষ দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, ততটুকু যদি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করতো, তবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যেত। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ যতক্ষণ মানুষ হালাল না খাবে, ততক্ষণ খওফ অর্জিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নির্ভীকতা প্রসঙ্গে যেসকল শাস্তি ও নিন্দাবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত জ্ঞাপন করে। কেননা, কোন বিষয়ের নিন্দা করা হলে তার বিপরীত বিষয়ের প্রশংসা হয়ে যায়। নৈরাশ্যের নিন্দা দ্বারা যেমন আশার ফযীলত জানা যায়, তেমনি ভয়শূন্যতার নিন্দা দ্বারা ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। বরং আমরা বলি, রিজার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত-জ্ঞাপক। কেননা, রিজা ও খওফ একটি অপরটির সাথে থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন প্রিয় বস্তু আশা করে, তা না পাওয়ার ভয়ও অবশ্যই তার থাকবে। যদি এ ভয় না থাকে, তবে সে বস্তু তার প্রিয় হবে না এবং তার অপেক্ষা করবে না।

মোটকথা, খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। উভয়টি একত্রিত হয়ে একটি অপরটির উপর প্রবল হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, অন্তর একটির সাথে মশগুল হবে এবং অপরটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত বিধায় আল্লাহ তা'আলা উভয়টি এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

অর্থাৎ, তারা আমাকে আশা ও ভয় সহকারে ডাকে।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় রিজা খওফ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এরা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কান্না খওফের ফল বিধায় কান্নার ফযীলত দ্বারাও খওফের ফযীলত

জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا

অর্থাৎ, তাদের উচিত কম হাসা এবং বেশী কাঁদা।

কান্নার ফযীলত দ্বারা হাদীসসমূহ পরিপূর্ণ। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন ঈমানদার বান্দা নেই, যার চোখ থেকে সামান্য পরিমাণ অশ্রুও নির্গত হয়ে কপালে প্রবাহিত হয়, এরপর আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন না।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন আল্লাহর ভয়ে ঈমানদারের অন্তর কেঁপে উঠে, তখন তার গোনাহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে। আরও বলা হয়েছে ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ الضَّرْعَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না, যে পর্যন্ত স্তন থেকে নির্গত দুধ স্তনে ফিরে না যাবে।

হযরত ওকবা ইবনে আমের একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ নিজের বাসনাকে সংযত রাখ, ঘর থেকে বের হয়ো না এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের কেউ কি বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গোনাহ স্মরণ করে ক্রন্দন করবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলার কাছে দুটি বিন্দুর চেয়ে উত্তম কোন বিন্দু নেই। একটি অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয় এবং দ্বিতীয়টি রক্তবিন্দু, যা জেহাদে শরীর থেকে নির্গত হয়।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَشْفِيَانِ بِتَزْرِفَةِ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَصِيْرَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَّالْاَضْرَاسُ جَمْرًا ـ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দুটি অশ্রু বিসর্জনকারী ক্রন্দনকারী চক্ষু দান কর, যা অশ্রু বিসর্জন করে শান্তি দিবে সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন অশ্রু রক্ত হয়ে যাবে এবং চোয়াল হয়ে যাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে ছায়ার মধ্যে রাখবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে একজন হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে কাঁদে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ যে কাঁদতে পারে, সে কাঁদুক এবং যে পারে না, সে কান্নার ভান করুক। হযরত মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির যখন ক্রন্দন করতেন, তখন চোখের পানি মুখমণ্ডলে এবং দাড়িতে মালিশ করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, যে জায়গায় অশ্রু লাগবে, সেখানে দোযখের আগুন পৌঁছবে না।

হযরত হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশে এমন ওয়ায করলেন, যার ফলে আমাদের অন্তর নরম হয়ে গেল এবং চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আমি যখন বাড়ী ফিরে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হলাম এবং সাংসারিক কথাবার্তায় মশগুল হলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আমার যে অবস্থা ছিল, তা মন থেকে উধাও হয়ে গেল এবং আমি দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়লাম। এরপর পুনরায় মনে পড়ল। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। কেননা, যে ভয় ও নম্রতা আমার মধ্যে ছিল, তা রইল না। এই চিন্তা মনে আসতেই আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং চিৎকার করে বলতে লাগলাম ঃ হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন ঃ হানযালা কিছুতেই মুনাফিক হয়নি। অতঃপর আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে একথা বলতে উপস্থিত হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি মোটেই মুনাফিক হওনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে ছিলাম। আপনি ওয়ায করলেন । তখন আমার অন্তরে যে ভয় এবং চোখে যে অশ্রু ছিল বাড়ী গিয়ে সংসারকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। এটা কি মুনাফেকী নয়? রসূলুল্লাহ

(সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হানযালা, এখন তুমি খওফের যে স্তরে অবস্থান করছ, যদি তা অব্যাহত থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমার সাথে পথিমধ্যে এবং শয্যায় মোসাফাহা করবে। তবে প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সময় আছে।

মোটকথা, রিজা ও কান্নার ফযীলত সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে, তাতে খওফ ও ভয়ের ফযীলতও বুঝা যায়। কারণ, এগুলো খওফের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন বিষয় খওফের কারণ এবং কোন কোন বিষয়ের কারণ স্বয়ং খওফ।

খওফের প্রবলতা ও রিজার প্রবলতার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ খওফ ও রিজার ফযীলত সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তাই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? খওফ উত্তম, না রিজা। মোটামুটিভাবে এ প্রশ্ন করা অর্থহীন। এটা এমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করে যে, রুটি উত্তম, না পানি? বলা বাহুল্য, এর উত্তর এটাই হবে যে, ক্ষুধার্তের জন্যে রুটি উত্তম এবং তৃষ্ণার্তের জন্যে পানি উত্তম। যদি কারও ক্ষুধা ও পিপাসা দুটিই হয়, তবে উভয়ের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, সেটিই ধরতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষুধা প্রবল হলে রুটি উত্তম হবে এবং তৃষ্ণা প্রবল হলে পানি উত্তম। উভয়টি সমান হলে রুটি ও পানি সমান হবে।

রিজা ও খওফ অন্তরের চিকিৎসার জন্যে ঔষধি বিশেষ। তাই এদের ফযীলত ততটুকুই হবে, অন্তরে যতটুকু ব্যাধি থাকবে। যদি অন্তরে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়ার রোগ থাকে, তবে খওফ তার জন্যে উত্তম। আর যদি অন্তরে নৈরাশ্য প্রবল থাকে, তবে রিজা উত্তম। এমনিভাবে যদি কারও উপর গোনাহ প্রবল হয়, তাহলেও খওফ উত্তম। এমনও বলা যায় যে, খওফ সর্বাবস্থায় উত্তম। কেননা, গোনাহ ও বিভ্রান্ত হওয়ার রোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশী। হাঁ, খওফ ও রিজার উৎসের প্রতি লক্ষ্য করলে রিজা উত্তম। কেননা, রিজার উৎস হচ্ছে রহমতের দরিয়া এবং খওফের উৎস গযব ও ক্রোধের দরিয়া। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে কৃপা ও রহমতসূচক গুণাবলীর প্রতি যার লক্ষ্য থাকবে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল হবে, যার পরে আর কোন মকাম নেই। খওফের মধ্যে কঠোরতাসূচক গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য থাকে বিধায় এই মনোযোগে মহব্বত ততটুকু থাকে না, যতটুকু রিজাতে থাকে। এ কারণে রিজা উত্তম।

যে পরহেযগার ব্যক্তি যাহেরী ও বাতেনী গোনাহ ছেড়ে দিয়েছে, তার জন্যে উত্তম হচ্ছে খওফ ও রিজা সমান সমান থাকা। এ কারণেই প্রসিদ্ধ একটি উক্তি বর্ণিত আছে যে, যদি মুমিনের খওফ ও রিজা পরিমাপ করা হয়, তবে উভয়টি সমান হবে। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস! আল্লাহকে এত ভয় কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের পুণ্য নিয়ে যাও, তবু তিনি সেগুলো কবুল করবেন না। পক্ষান্তরে আশাও এই পরিমাণ কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে সকল মানুষের গোনাহ নিয়ে যাও, তবু তিনি তোমাকে মাফ করে দিবেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা হয় যে, একজন ব্যতীত সকল মানুষ দোযখে যাবে, তবে আমি বলব সেই এক ব্যক্তি আমি হব। পক্ষান্তরে যদি প্রচার করা হয় যে, সকল মানুষ জান্নাতে যাবে কিন্তু শুধু এক ব্যক্তি যাবে না, তবে আমি ভয় করব যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হতে পারি। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খওফ ও রিজা।

কিন্তু যদি কোন গোনাহগার ব্যক্তি ধারণা করে যে, যারা দোযখে যাবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে , তবে এটা রিজা নয় বরং তার বিভ্রান্তি। অধিকাংশ লোকের মধ্যে রিজার প্রাবল্য বিভ্রান্তিতে পড়া এবং মারেফত কম হওয়ার পরিচায়ক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে খওফ ও রিজাকে এক সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا অর্থাৎ, তারা আমাকে উৎসাহ ও ভীতি সহকারে ডাকে।

কিন্তু হযরত উমরের মত লোক কোথায়, যার খওফ ও রিজা সমান সমান হবে? তাই বর্তমানে যারা আছে, তাদের জন্যে খওফের প্রবলতাই উত্তম— যদি খওফের কারণে নৈরাশ্যে ডুবে না যায়। বলা বাহুল্য, যে খওফ নৈরাশ্যের জন্ম দেয় এবং মানুষ আমল বর্জন করে গোনাহে ডুবে

যায়, তা খওফ নয়। খওফ তাই, যা আমলে উৎসাহিত করে এবং যাবতীয় কামনা-বাসনা মলিন মনে হতে থাকে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত নিছক খওফের দরুন করে, সে ফিকর ও ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যায়। আর যে নিছক রিজার দরুন এবাদত করে, সে বিভ্রান্তির প্রান্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি খওফ, রিজা ও মহব্বত এই তিনটির অধীনে কেউ এবাদত করে, তবে সে সরল ও সঠিক পথে অবস্থান করে। এতে বুঝা যায় যে, এবাদতে এই তিন বিষয়ে সমন্বয় জরুরী। কিন্তু খওফ প্রবল থাকা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত অধিক সঙ্গত। মৃত্যুর সময় অবশ্য রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, খওফ আমলে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বেত্রদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত। মৃত্যুর সময় কোন আমল করা মানুষের জন্যে সম্ভব নয়। এ সময় খওফের জরুরী কার্যকলাপ বরদাশত করাও অসম্ভব। এতে আগামী কালের মৃত্যু আজই হয়ে যায়। হাঁ, রিজার দ্বারা অন্তরে শক্তি আসে এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। আল্লাহর মহব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে সফর করাই মানুষের জন্যে উপযুক্ত। তাই আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর মহব্বত সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করেন। এ প্রসঙ্গে রসূলে আকরাম (সাঃ) যে দোয়া করতেন, তা করাই আমাদের জন্যে শ্রেয়। তিনি এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দান কর তোমার মহব্বত এবং তার মহব্বত, যে তোমাকে মহব্বত করে এবং সে আমলের মহব্বত, যা আমাকে তোমার নিকটবর্তী করে। তোমার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দাও।

সারকথা, মৃত্যুর সময় রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, এতে মহব্বত থাকে। মৃত্যুর পূর্বে খওফ উপযুক্ত। কেননা, এর দ্বারা কামনা-বাসনার

আগুন চমৎকাররূপে নির্বাপিত হয় এবং দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهٖ

অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তা সম্পর্কে সুধারণা ছাড়া তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ আমার কাছে আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বল এবং ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত রাখ। আমি আল্লাহর সাথে সুধারণা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই। হযরত সুফিয়ান ছওরী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে নিজের মধ্যে খওফ অনুভব করলে আশার কথা শুনার জন্যে আলেমগণকে চারপাশে একত্রিত করেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা প্রিয় হোক— এটাই এর উদ্দেশ্য। এজন্যেই হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী আসে—আমাকে আমার বান্দাদের প্রিয়জন করে দাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তা কেমন করে। এরশাদ হল, তাদের কাছে আমার নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণনা কর।

খওফ অর্জন করার উপায় ঃ খওফ তথা ভয়ের দু'টি মকাম রয়েছে— (১) আল্লাহ তা'আলার আযাবকে ভয় করা এবং (২) তাঁর সত্তাকে ভয় করা। দ্বিতীয় প্রকার খওফ তাদের হয়, যারা এলম ও কাশফ তথা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। প্রথম প্রকার খওফ সাধারণ মানুষের হয়, যা কেবল জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস স্থাপন এবং এগুলোকে এবাদত ও নাফরমানীর প্রতিফল বিশ্বাস করার কারণে সৃষ্টি হয়। এই খওফ অনবধানতা ও ঈমানের দুর্বলতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিয়ামতের আতঙ্ক চিন্তা করলে এবং আখেরাতের বিভিন্ন কথা স্মরণ করলে এই অনবধানতা দূরীভূত হয়ে যায়। এছাড়া খওফকারীদেরকে দেখলে এবং তাদের কাছে বসলেও এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার খওফ অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তাকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে পড়া এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টির আশংকা করা। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ বিচ্ছেদের ভয়ের তুলনায়

দোযখের ভয় সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতই। এই খওফ আলেমগণের হয়। সেমতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ, আল্লাহকে তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই ভয় করে।

সাধারণ মুমিনরাও এই ভয়ের কিছু অংশ পায়; কিন্তু তাদের ভয় নিছক তাকলীদ তথা অনুকরণ হয়ে থাকে। যেমন অবুঝ শিশু তার পিতার অনুকরণে সাপকে ভয় করে। এই ভয়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বিধায় এটা দুর্বল হয়ে থাকে এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। তবে যদি ভয়ের কারণসমূহ সর্বদা অনুধাবন করা যায় এবং তদনুযায়ী দীর্ঘদিন এবাদত ও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা হলে খওফ শক্তিশালী হয়।

মোটকথা, যে ব্যক্তি মারেফতে উন্নীত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ চিনতে সক্ষম হয়, সে আপনা-আপনিই খওফ করতে থাকে। তার জন্যে কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। যেমন কোন ব্যক্তি হিংস্র জন্তুর স্বরূপ জেনে নেয়, এরপর নিজেকে তার নাগালের মধ্যে দেখতে পায়, সে আপনা-আপনিই হিংস্র জন্তুকে ভয় করতে থাকবে। এজন্যে তার কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে না। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন — আমাকে ভয় কর যেমন হিংস্র জন্তুকে ভয় করে থাক। বলা বাহুল্য, হিংস্র জন্তুকে ভয় করার জন্যে তার স্বরূপ জানা এবং তার থাবায় পড়ার অবস্থাটি জানাই যথেষ্ট। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানবে ও চিনবে, সে একথাও জানবে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন। কোন কিছুর পরওয়া করেন না। তিনি কাউকে ভয় করেন না। এরপর আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যারা আরেফ তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী তাদের সবসময় খাতেমা অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার ভয় লেগে থাকে। এর কারণ একাধিক, যা অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে সংঘটিত হয়। বেদআত, গোনাহ ও নিফাকও এসব কারণের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এসব থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ

নিজেকে নিফাক থেকে মুক্ত বলে ধারণা করে, তবে তাও নিফাক। কেননা, প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে— যে নিফাকের ভয় করে না, সে মুনাফিক। জনৈক বুযুর্গ এক আরেফকে বললেন ঃ আমি নিজের জন্যে নিফাকের ভয় করি। আরেফ বললেন ঃ যদি তুমি মুনাফিক হতে, তবে নিফাকের ভয় করতে না। মোটকথা, আরেফের দৃষ্টি সর্বদা অন্তিম মুহূর্তের প্রতি থাকে— তা শুভ হবে, না অশুভ। হাদীস শরীফে আছে—

اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقٰى لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَابَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُّسْتَعْتِبٍ وَلَابَعْدَ الدُّنْيَادَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ۔

অর্থাৎ, মুমিন বান্দা দুটি ভয়ের মাঝখানে অবস্থান করে। এক, অতীত সময়। আল্লাহ তাতে কি করবেন, তা সে জানে না। দুই, অনাগত সময়, যাতে আল্লাহ কি ফয়সালা দেবেন, তা তার জানা নেই। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন উপায় নেই এবং দুনিয়ার পরে জান্নাত অথবা দোযখ ছাড়া কোন গৃহ নেই।

মন্দ অন্তিম মুহূর্ত ঃ এখন মন্দ অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে। কেননা, যারা আরেফ, তারা অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার ভয় বেশী করে থাকে। জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়া দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ। তা এই যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রকাশ পাওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ অথবা অস্বীকৃতি প্রবল হয়ে যাওয়া এবং তদবস্থায়ই আত্মা নির্গত হওয়া। এ সন্দেহ ও অস্বীকৃতি আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে অন্তরায় ও দূরত্বের কারণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার যা এরচেয়ে লঘু, তা এই যে, মৃত্যুর সময় বান্দার মনে কোন পার্থিব বস্তুর মহব্বত প্রবল হয়ে যাওয়া অথবা কোন পার্থিব কামনা-বাসনা অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলা, যাতে অন্য কোন কিছুর অবকাশ না থাকে। এই আচ্ছন্নতার ফলে বান্দার মুখমন্ডল ও মস্তক

দুনিয়ার দিকে ফিরানো থাকবে। যখন মুখমণ্ডল আল্লাহর দিক থেকে ফিরে যাবে, তখন অন্তরায় সৃষ্টি হবে এবং আযাব নাযিল হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন কেবল আল্লাহর অন্তরালে অবস্থানকারীদেরকে স্পর্শ করবে। যে ঈমানদারের অন্তর দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত, আগুন তাকে বলবে ঃ হে ঈমানদার! এগিয়ে চল। তোমার নূর আমার শিখাকে নির্বাপিত করে দিয়েছে। মোটকথা, দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হওয়ার সময় আত্মা নির্গত হলে তা আশংকার বিষয়। তবে মূল ঈমান ও খোদায়ী মহব্বত দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় এই দুঃখজনক অবস্থা স্থায়ী হবে না। যদি তার ঈমানের শক্তি মেছকাল পরিমাণও হয়, তবে সত্বরই সে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি আরও কম হয়, তবে অনেক দিন দোযখে থাকতে হবে। আর যদি ঈমানের শক্তি রতি পরিমাণ হয়, তবে হাজারো বছর পরে হলেও দোযখ থেকে রেহাই পাবে।

যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা প্রশ্ন করতে পারে যে, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর পরেই অপরাধীকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে। তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা বিলম্বিত হয় কেন? জওয়াব এই যে, যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা বেদআতী এবং আল্লাহর নূর, কোরআনের নূর ও ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মতে এটাই অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ যে, কবর দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। সহীহ হাদীস থেকেও তাই জানা যায়। সুতরাং যদি মানুষের অন্তিম মুহূর্ত শুভ না হয় এবং হতভাগ্য হয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে, তবে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সে আযাবের পাত্র হয়ে যায় এবং কবর থেকেই আযাব শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সময়ভেদে তার কবরে দোযখের সত্তরটি দরজা খুলে যায়। আযাবের প্রকারও সময়ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কবরে রাখার পর মুনকির-নকীরের সওয়াল হয়, এরপর শাস্তি হয়, এরপর হিসাব-নিকাশের জটিলতা এবং কিয়ামতে সকলের সমক্ষে অপমান ও লাঞ্ছনা হয়।

জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার কারণ দুটি বিষয়ে সীমিত।

প্রথম এই যে, পূর্ণ সংসার নির্লিপ্ততা ও যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন সত্ত্বেও বেদআতী হওয়া। বেদআতের অর্থ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব ও ধর্মমত অনুসরণ করা নয়; বরং বেদআতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করা নিজের খেয়ালখুশী, অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অথবা এমনি ধরনের অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে। এরূপ বেদআতী ব্যক্তির যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন তার সামনে এ সত্য আপনিই উদঘাটিত হয়ে যায় যে, তার পূর্ববর্তী বিশ্বাস নিছক মূর্খতাপ্রসূত ও ভ্রান্ত ছিল। এমতাবস্থায় সে কেবল এই বিশ্বাসটিকেই মিথ্যা মনে করে না, বরং অন্যান্য বাস্তব ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহকেও বাতিল মনে করতে থাকে অথবা সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ করতে থাকে। যদি এ অবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, তবে তার অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হয় এবং সে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ লোককেই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় উদঘাটিত হল, যা তারা ধারণাও করত না।

নিম্নোক্ত আয়াতেও এরূপ লোকদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আমলে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে বলব? আমলে ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করছে।

মোটকথা, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও কর্ম সম্পর্কে নিজের মতামত দ্বারা অথবা অন্যের অনুকরণ দ্বারা কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করে, তারা বেদআতী এবং তাদের জন্যে উপরোক্ত বিপদাশংকা

বিদ্যমান। এই বিপদাশংকা দূর করার জন্যে সংসার অনাসক্তি ও সৎকর্ম যথেষ্ট নয়; বরং সত্য বিশ্বাস ছাড়া এ থেকে নাজাতের কোন উপায় নেই। সরল ও সাদাসিধে মানুষ, যারা আল্লাহ , রসূল ও আখেরাতে সংক্ষেপে ঈমান রাখে এবং এর উপরই পাকাপোক্ত থাকে— কোনরূপ তর্ক-বিতর্কের ধারে-কাছে যায় না, তারা এই বিপদাশংকা থেকে দূরে রয়েছে। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

অর্থাৎ, অধিকাংশ জান্নাতী সরল ও আত্মভোলা।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আকায়েদ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করেছেন। তারা সাধারণ মানুষকে একথাই বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয় নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে যা বুঝে আসে, তাকে সঠিক মনে করতে হবে। কেননা, সিফাত সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ এবং এ পথ খুবই দুর্গম।

অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা এবং সংসার আসক্তির প্রবলতা। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর মহব্বতও দুর্বল হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হয়। এই প্রবলতা এতদূর পৌঁছে যে, অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের জন্যে কোন স্থান থাকে না— মহব্বতের জল্পনা থেকে যায় মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ফলে, অন্তর কাল ও কঠিন হয়ে যায়। এরপর উপর্যুপরি গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ও মোহরের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে আল্লাহর মহব্বত আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ, তখন মনে হতে থাকে, সর্বাধিক প্রিয় বস্তুর বিরহের সময় বুঝি এসে পড়েছে। এই বিরহের কারণে অন্তর দারুণভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে ধারণা আসে যে, আল্লাহ তা'আলা কেন এই মৃত্যুকে প্রেরণ করলেন? মৃত্যুর আগমন ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যদি ঘটনাক্রমে এই বিদ্বেষ থাকাকালে আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যায়, তবে অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়া নিশ্চিত। এ

থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল দেখে, সে এই বিপদাশংকা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল শিকড়। এটাই দুরারোগ্য ব্যাধি। সকল মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কারণ, তারা আল্লাহকে কম চিনে। চিনলে অবশ্যই মহব্বত করত। যে চিনে, সে তাকে মহব্বত করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ -

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, উপার্জিত ধন-সম্পদ,ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দসই বাসভবন আল্লাহ, রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর।

মোটকথা, স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের মত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দেয়া মৃত্যু খারাপ মনে হতে থাকে এবং তদবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর প্রতি বিদ্বেষবশত পলায়ন করে, এরপর জোরজবর দস্তি গ্রেফতার হয়ে প্রভুর সামনে আনীত হয়। প্রভুর হাতে এই গোলামের যে ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মৃত্যু আল্লাহর মহব্বতের উপর হয়, সে সেই অনুগত গোলামের মত আল্লাহর সামনে আসে, যে পরম আগ্রহ সহকারে প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও সফরের বিপদাপদ সহ্য করে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়। এই গোলাম দরবারে পৌঁছা মাত্রই যে আদর-যত্ন ও আপ্যায়ন লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের খওফ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি দাঁড়িয়ে কক্ষের মধ্যে সূরা-কেরাত পাঠ করতে শুরু করতেন এবং ভেতরে ও বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়েই তা করতেন। একবার সূরা হাক্কার একটি আয়াত পাঠ করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আরেক বার জিবরাঈলের আকৃতি দেখার পর তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর বক্ষে ডেগচির স্ফুটনের ন্যায় শব্দ শুনা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—আমার কাছে জিবরাঈল যখনই আগমন করতেন, প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। বর্ণিত আছে, যখন শয়তান বিতাড়িত হল, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল ও মীকাঈল ক্রন্দন শুরু করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কাঁদছ কেন? তারা আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমরা আপনার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত নই। আদেশ হল ঃ তোমরা এমনিই থাক। অর্থাৎ আমার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত থেকো না।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেওয়ায়েত করেন—যখন দোযখ সৃষ্টি হল, তখন ভয়ে ফেরেশতাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বনী আদম সৃজিত হলে তাদের মন স্থির হল। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, আমি মীকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি না কেন! তিনি বললেন ঃ দোযখ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তিনি হাসেন না। আরও বর্ণিত আছে—আল্লাহ তা'আলার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আগুন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই ভয়ে হাসেন না যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়ে আগুনের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাইরে বের হলে তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন এবং খোরমা খেতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি খাচ্ছ না কেন? আমি আরয করলাম ঃ আমার খোরমা খাওয়ার ক্ষুধা নেই। তিনি

বললেন ঃ আমার ক্ষুধা আছে। আমার খাদ্য গ্রহণ না করার আজ চতুর্থ দিন। এ কয়দিন আমি খাদ্য পাইনি। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে চাইলে তিনি আমাকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দান করে দিতেন। হে ইবনে উমর, যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে থাকবে, যারা বছরের খোরাক সঞ্চয় করে রাখবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? তাদের একীন খুব দুর্বল হবে। ইবনে উমর বলেন ঃ আমরা বাগানেই ছিলাম, এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

অর্থাৎ, অনেক জন্তু রয়েছে, যারা তাদের রূযী সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রূযী দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ শোষণ করার এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করার হুকুম দেননি। যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী জীবনের উদ্দেশ্যে দীনার সঞ্চিত রাখে, তার জীবন আল্লাহর হাতেই। সাবধান, দীনার ও দেরহাম জমা করে রেখো না এবং আগামীকালের জন্যে জীবনোপকরণ সঞ্চয় করো না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর অন্তরের স্ফুটন এক ক্রোশ দূর থেকে শুনা যেত। হযরত মোজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আঃ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেজদায় পড়ে ক্রন্দন করলেন এবং মাথা তুললেন না। ফলে, তার চোখের পানিতে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠল এবং তাতে তার মস্তক আবৃত হয়ে গেল। গায়েবী আওয়াজ হল, হে দাঊদ, তুমি ক্ষুধার্ত হলে খাওয়া দরকার এবং তৃষ্ণার্ত হলে পানি পান করা উচিত। বস্ত্রহীন হলে বস্ত্রপ্রাপ্ত হবে। হযরত দাঊদ সজোরে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ভয়ের উত্তাপে কাঠ জ্বলে গেল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে তওবা ও মাগফেরাত নাযিল করলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমার গোনাহ আমার হাতে সমর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের তালুতে তাঁর

গোনাহ লিখে দেয়া হল। তিনি যখন পানাহার করতেন অথবা কোন উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেন, তখন এ গোনাহ দেখে ক্রন্দন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার সামনে পানির পেয়ালা এক-তৃতীয়াংশ খালি পেশ করা হত। তিনি যখন নিজের গোনাহ দেখতেন, তখন পেয়ালা ঠোঁটের সাথে মিলানো পর্যন্ত অশ্রুতে তা ভরে যেত।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে খওফের প্রাবল্য ঃ বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন একটি পাখী দেখে তাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ হায়, আমিও যদি তোমার মত পাখী হতাম। মানুষ না হতাম! হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম এবং কেউ তা কেটে ফেলত! হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত না হওয়া আমার কাছে খুব ভাল মনে হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া আমার কাছে ভাল মনে হয়।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) যখন কোরআন পাকের কোন আয়াত শুনতেন, তখন ভয়ের আতিশয্যে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখার জন্যে লোকজন আসা-যাওয়া করত। একদিন তিনি মাটি থেকে একটি কুটা হাতে তুলে বললেন। চমৎকার হত যদি আমি কুটা হতাম এবং কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না হতাম। হায়, আমি যদি বিস্মৃত হয়ে যেতাম! হায়, আমার জননী যদি আমাকে প্রসব না করতেন। তাঁর মুখমন্ডলে অশ্রুর দুটি কাল রেখা ছিল। তিনি বলতেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করে না। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, সে খেয়ালখুশী অনুযায়ী কথা বলে না। কিয়ামত না হলে আমরা অন্য কিছুর নমুনা দেখতাম। একদিন তিনি এক ব্যক্তির ঘরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিল। তিনি দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। যখন সে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (আল্লাহর আযাব অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।) পাঠ করল, তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর বাড়ী চলে এলেন এবং মাসাধিক কাল অসুস্থ রইলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসত কিন্তু কেউ জানত না, তার অসুখটা কি?

হযরত আলী (রাঃ) একদিন ফজরের নামাযের পর বিষণ্ন মনে বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহচরগণকে দেখেছি। কিন্তু আজ তাদের মত কোনকিছু দেখি না। বিক্ষিপ্ত কেশ ও ধূলি-ধূসরিত থাকাই তাদের নিয়ম ছিল। তাদের দু'চোখের মাঝখানে সেজদার দাগ পড়ে গিয়েছিল। তারা রাতের বেলায় সেজদা করতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন পাঠ করতেন এবং এবাদতে কপাল ও পদযুগলের উপর পালাক্রমে ভর দিতেন। যখন সকাল হত, তখন প্রবল বাতাসে যেমন বৃক্ষ নড়াচড়া করে, তেমনি তারা কাঁপতেন। চোখের পানিতে তাদের পরিধেয় বস্ত্র ভিজে যেত। কিন্তু আজকাল আমি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করছি, যারা রাতের বেলায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন থাকে।

এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ ছাইভস্ম হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাওয়াকে আমি ভাল মনে করি। হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ বলেন ঃ আমি যদি ভেড়া হতাম এবং আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে যবাহ করে খেয়ে ফেলত, তবে তাই ভাল ছিল। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন যখন উযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে যেত। পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করত, উযু করার সময় আপনার এ অবস্থা হয় কেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা জান আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই?

মূসা ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমরা যখন সুফিয়ান ছওরীর কাছে বসতাম, তখন তাঁর ভয় দেখে মনে হত আগুন যেন চারদিক থেকে আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। মেসওয়ার ইবনে মাখরামা ভয়ের আতিশয্যে কোরআন পাক মোটেই শুনতে পারতেন না। কেউ এক হরফ অথবা এক আয়াত পাঠ করলে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠতেন এবং কয়েক দিন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত না। একদিন খশম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি আয়াত পাঠ করল—

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ـ

অর্থাৎ, যে দিন আমি মুত্তাকীদেরকে রহমানের কাছে সমবেত করব এবং হাঁকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।

আয়াতটি শুনে মেসওয়ার বললেন ঃ আমি তো অপরাধীদের একজন—মুত্তাকী নই কারী সাহেব, আবার পড়ুন তো! পুনরায় পাঠ করা হলে তিনি সজোরে চিৎকার করে আখেরাতের পথিক হয়ে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন)। ক্রন্দনকারী এয়াহইয়ার সামনে কেউ এ আয়াতটি পাঠ করল—

ولو ترى اذ وقفوا على ربهم

অর্থাৎ, তাদের পালনকর্তার সামনে তাদের দণ্ডায়মান করানোর দৃশ্যটি যদি আপনি দেখতেন!

আয়াতটি পাঠ করলে তিনি এমন এক চিৎকার দিলেন, যার ফলে দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। বসরার আশপাশ থেকেও লোকজন এসে তাঁকে দেখে গেল।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি কা'বা গৃহের তওয়াফ করছিলাম, এমন সময় দেখি এক যুবতী কা'বার গেলাফ ধরে বলে যাচ্ছে—ইলাহী! অনেক কামনার আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু আযাব বাকী রয়ে গেছে। ইলাহী! তোমার কাছে দোযখ ছাড়া কি অন্য কোন শাস্তি নেই? মহিলাটি একথা বলে কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। আমি এ অবস্থা দেখে নিজের কথা ভেবে চিৎকার করে উঠলাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খওফকারীর স্বরূপ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ যার অন্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন এবং চক্ষু কান্নারত, সেই খওফকারী।

হযরত হাসান বসরী এক হাসিতে নিমজ্জিত যুবকের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাকে বললেন ঃ তুমি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? যুবক বলল ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি জান্নাতে যাবে, না দোযখে— এটা তোমার জানা আছে কি? সে আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে এ হাসি কেন? রাবী বলেন ঃ এরপর থেকে এ যুবককে কেউ হাসতে দেখেনি।

হাম্মাদ যখনই বসতেন, এমনভাবে বসতেন যেন অর্ধেক দাঁড়ানো।

কেউ তাকে শান্তভাবে বসতে বললে তিনি বলতেন ঃ ভয়শূন্য ব্যক্তি শান্তভাবে বসে। আমি ভয়শূন্য নই। কারণ, আমি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করেছি।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে গাফলতে ফেলে রেখেছেন। এটাও রহমত বটে। নতুবা আল্লাহর ভয়ে সকলেই মারা যেত।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছি মৃত্যুর সময় মানুষকে বলব— তোমরা আমাকে বেড়ী পরিয়ে শৃঙ্খলিত করে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে, যেমন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাতেম আসাম বলেন ঃ কোন মনোরম বাসগৃহের জন্যে পাগল হয়ো না। কেননা, জান্নাতের চেয়ে অধিক মনোরম কোন স্থান নেই। কিন্তু আদমের অবস্থা তাতে যা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিক এবাদতের জন্যে উতালা হয়ো না। কারণ, অধিক এবাদতের পর ইবলীসের অবস্থা সকলেরই জানা। অধিক জ্ঞানের জন্যে গর্বিত হয়ো না। কারণ, বালআম ইসমে আযমের জ্ঞান রাখত। কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে? সৎকর্মপরায়ণদের সাথে সাক্ষাতের জন্যেও অধীর হয়ো না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর চেয়ে বেশী সৎকর্মপরায়ণ কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ কোন কোন আত্মীয়ও শত্রুর জন্যে মোটেই কল্যাণকর হয়নি।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযীর জননী তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জানি। তুমি শৈশবেও পূত-পবিত্র ছিলে এবং বড় হয়েও ভালই আছ। কিন্তু তুমি দিবারাত্র এবাদতই করে যাচ্ছ। এ কাজটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর হতে পারে। এত পরিশ্রম করার তোমার দরকার কি? তিনি বললেন ঃ হে স্নেহময়ী জননী, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন গোনাহ করতে দেখে নেন, অতঃপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলেন— আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তবে এ আশংকা থেকে নির্ভয় হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ কোন প্রেরিত পয়গম্বর, নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং সাধু ব্যক্তির প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নেই। কেননা, কিয়ামতের দিন তাদের কোন শাস্তি হবে না। আমার ঈর্ষা কেবল সে ব্যক্তির প্রতি, যে জন্মগ্রহণই করেনি।

বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারী যুবক দোযখের ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁদত। এমনকি কান্নার কারণে সে ঘর থেকেও বের হত না! রসূলে করীম (সাঃ) একদিন তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরলেন! আনসারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে মাটিতে পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। দোযখের ভয় তাঁর কলিজাকে খন্ড-বিখন্ড করে দিয়েছে।

ইবনে আবী মায়সারা শয্যা গ্রহণের পূর্বক্ষণে বলতেন ঃ হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত। তার মা একদিন বললেন ঃ হে মায়সারা, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তুমি মুসলমান। অতএব, এত ভয় করছ কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমরা সবাই দোযখে যাব। দোযখ থেকে বের হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এটাই ভয়ের কারণ।

হযরত আতায়ে সলমীও খওফকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কখনও জান্নাতের প্রার্থনা করতেন না—কেবল ক্ষমার আবেদন করতেন। রুগ্নাবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনার মন কি চায়? তিনি বললেন ঃ দোযখের ভয় আমার মনে কোন কিছু চাওয়ার জায়গা রাখেনি। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত কখনও আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি এবং এ সময়ে কখনও হাসেননি। একদিন আকাশের দিকে মাথা তুললে ভয়ে ভূতলশায়ী হলেন এবং তাঁর নাড়িভুঁড়ি ফেটে গেল। তিনি রাতের বেলায় নিয়মিত নিজ দেহে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিতেন, কোথাও বিকৃত হয়ে যায়নি তো! যখন ধূলিঝড় শুরু হত অথবা বজ্রপাত হত অথবা খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে যেত, তখন বলতেন ঃ এসব বিপদাপদ আমারই কারণে। আমি মারা গেলে মানুষ সুখ পাবে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন—একদিন আমরা উতবা নামক গোলামের সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন যুবক ও প্রৌঢ় ছিল, যারা এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়ত। অধিক নামাযের কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিল, চক্ষু কোটরাগত ছিল এবং ত্বক হাতের সাথে লেগে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখলে মনে হত যেন কবর থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা বলত ঃ আল্লাহ

তা'আলা এবাদতকারীদেরকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং নাফরমানদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা এসব কথা বলাবলি করতে করতে এগুচ্ছিল এমন সময় এক জায়গায় পৌঁছে তাদের একজন বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তাঁর চারপাশে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। কন্‌কনে শীত ছিল। কিন্তু তাঁর কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল। তাঁর চোখে-মুখে পানির ছিটা দেয়া হলে জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গীরা ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এখানে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছিলাম। এ জায়গা দেখতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়ে গেল এবং আমি ভয়ে সংজ্ঞা হারালাম।

সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি জনৈক দরবেশের সামনে এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ـ

অর্থাৎ, যেদিন আমি তাদের মুখমণ্ডলকে জাহান্নামে ওলট-পালট করব, তারা বলবে, হায় আমাদের আফসোস! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!

এতটুকু শুনেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে বলল ঃ হে সালেহ, আর কিছু পাঠ কর। আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি পাঠ করলাম ঃ

إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

অর্থাৎ, যখন তারা দোযখ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এতটুকু শুনে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যুরারা ইবনে আবী আওফা ফজরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (অর্থাৎ, যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে) পাঠ করলেন, তখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ইয়াযীদ রাককাশী হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ ইয়াযীদ, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, মৃত্যুবরণকারী খলীফাগণের মধ্যে আপনি প্রথম খলীফা হবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে অনেক খলীফা মৃত্যুবরণ করেছেন। খলীফা কেঁদে বললেন ঃ আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার ও হযরত আদম (আঃ)-এর মাঝখানে এমন কোন মহৎ ব্যক্তি নেই, যে মৃত্যুবরণ করেনি। খলীফা কাঁদলেন এবং বললেনঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার এবং জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে কোন মনযিল নেই। একথা শুনে খলীফা সংজ্ঞা হারালেন।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুতি।

এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) চিৎকার করে উঠেন এবং মাথায় হাত রেখে বাইরে বের হয়ে যান। এরপর তিন দিন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হযরত দাউদ তায়ী জনৈকা মহিলাকে দেখলেন, সে তার পুত্রের কবরে বসে কেঁদে বলছিল, বৎস, জানি না তোমার কোন্ গালকে সর্ব প্রথম পোকা খেয়েছে। দাউদ একথা শুনেই সেই স্থানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আম্বরী বর্ণনা করেন, একবার হাদীসবিদগণ হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াসের দরজায় সমবেত হলেন। তিনি এক জানালা পথে তাদের দিকে মাথা বের করলেন। কাঁদার দরুন তাঁর দাড়ি নড়াচড়া করছিল। তিনি বললেন ঃ ভাইসব, কোরআনের উপর সর্বক্ষণ আমল কর এবং নামায যথারীতি কায়েম কর। এটা হাদীসের সময় নয়; বরং মিনতি, অসহায়তা ও ডুবন্ত ব্যক্তির অনুরূপ দোয়া করার সময়। এ যুগে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জিহ্বার হেফাযত করা, নিজের ভেদ প্রকাশ না করা এবং অন্তরের চিকিৎসা করা। জানা বিষয়কে কর্মপন্থা করবে এবং অজানা বিষয়কে বর্জন করবে। একবার তিনি খওফের কারণে উদভ্রান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ জানি না।

যুর ইবনে উমর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, অন্যরা কিছু বললে কেউ কাঁদে না; কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন, তখন চারদিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনি! পিতা বললেন ঃ যে মহিলার সন্তান মারা যায়, তার কান্না এবং যে মহিলা পারিশ্রমিক নিয়ে কাঁদে—উভয়ের কান্নায় তফাৎ অবশ্যই হবে। উদ্দেশ্য এই যে, খওফের কান্না অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

সালেহ মুররী বলেন ঃ একবার ইবনুস সাম্মাক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে আপনার সম্প্রদায়ের আবেদদের কিছু অবস্থা দেখান। আমি তাকে এক মহল্লায় কুঁড়েঘরে বসবাসকারী এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তার কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে তখন মাদুর তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। আমি তার সামনে এ আয়াতটি পাঠ করলাম —

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ -

অর্থাৎ, যখন তাদের ঘাড়ে থাকবে বেড়ী এবং তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

আয়াতখানি শুনে লোকটি চিৎকার করে বেহুশ হয়ে গেল। আমরা তাকে তদবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমরা দ্বিতীয় এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলাম এবং তার সামনে একই আয়াত পাঠ করলাম। সেও চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেখান থেকে আমরা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বললঃ চলে আসুন; কিন্তু আমাকে আমার পরওয়ারদেগার থেকে ফিরাতে পারবেন না। আমি পাঠ করলাম ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ

অর্থাৎ, এটা তার জন্যে, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার শাস্তিবাণীকে!

সে এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে, তার নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। এ রক্তের মধ্যেই সে ছটফট করছিল। অবশেষে রক্ত শুকিয়ে গেল। আমরা তাকেও এমনি অবস্থায় রেখে চলে এলাম।

এভাবে আমি ইবনুস সাম্মাককে ছয় ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুরিয়ে আনলাম এবং প্রত্যেককেই বেহুশ অবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে সপ্তম ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে অনুমতি দিল। আমরা দেখলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধ জায়নামাযে বসে আছে। আমরা সালাম বললে সে টের পেল না। আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম ঃ খবরদার, আগামীকাল মানুষকে দাঁড়াতে হবে। বৃদ্ধ বলল ঃ হতভাগা, কার সামনে? একথা বলার পর সে হতভম্ব হয়ে রইল। তার মুখ খোলা এবং দৃষ্টি উপরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে নিচু স্বরে "উহ্" "উহ্" বলতে শুরু করল। অবশেষে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তার স্ত্রী বলল ঃ এখন আপনারা তার কাছ থেকে চলে যান। কেননা, এখন তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে না। তার অবস্থা বদলে গেছে। কিছুদিন পর আমি সেখানকার লোকদের কাছে এ সাত ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাদের তিনজন সুস্থ হয়ে গেছে এবং তিনজন মারা গেছে। আর বৃদ্ধ তিন দিন পর্যন্ত তেমনি হতভম্ব ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রয়েছে। এ সময়ে সে ফরয নামাযও পড়ত না। তিন দিন পর সে জ্ঞান ফিরে পেল।

বর্ণিত আছে, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদকে মানুষ আবদালের মধ্যে গণ্য করত। তিনি এ মর্মে কসম খান যে, জীবনে কখনও হাসবেন না এবং কখনও বিছানায় শুয়ে ঘুমাবেন না। কখনও ঘৃতপক্ব খাদ্য খাবেন না। তিনি আমৃত্যু এ কসম পূর্ণ করেন। একবার হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে প্রশ্ন করলেন ঃ আমি শুনেছি আপনি কখনও হাসেন না। এটা কি ঠিক? তিনি বললেন ঃ দোযখ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ী তৈরি আছে এবং দোযখের ফেরেশতারাও তৎপর রয়েছে। এমতাবস্থায় হাসার কোন উপায় আছে কি?

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু সাঈদ! আপনার সকাল কেমন কেটেছে? তিনি বললেনঃ ভালই। লোকটি

বলল ঃ আপনার অবস্থা কি? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার অবস্থা জানতে চাও? আচ্ছা বলত, যদি কিছু লোক নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের মাঝে পৌঁছায়। এরপর নৌকা ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে যায় এবং আরোহীদের প্রত্যেকেই এক একটি তক্তা জড়িয়ে ধরে ভাসতে থাকে, তবে তোমার চিন্তায় তাদের অবস্থা কেমন হবে? লোকটি বলল ঃ তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে সংকটাপন্ন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তাদের চেয়েও ভয়ানক।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের এক বাঁদী তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করল। অতঃপর গৃহ সংলগ্ন মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ে নিদ্রা প্রবল হওয়ায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে স্বপ্নে কান্নাকাটি করল। নিদ্রাভঙ্গের পর হযরত উমরের খেদমতে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? বাঁদী বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখলাম, দোযখ দোযখীদের জন্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরপর পুলসিরাত এনে তার পৃষ্ঠে স্থাপন করা হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে আনা হল এবং পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে কিছুদূর এগুতেই পুল উল্টে গেল এবং আবদুল মালেক দোযখে পড়ে গেল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আবদুল মালেকের পুত্র ওলীদকে আনা হল। সেও কিছুদূর এগুতেই পুল কাত হয়ে গেল এবং সে দোযখে পতিত হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ ওলীদের পর সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেককে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে-ও কিছুদূর যেতেই পুল আড়াআড়ি হয়ে গেল এবং সে দোযখে পড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আপনাকে আনা হল। এতটুকু বলতেই খলীফা সজোরে এক চিৎকার মেরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাঁদী উঠল এবং তাঁর কানে জোরে জোরে বলতে লাগল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি আপনি বেঁচে গেছেন। আপনি মুক্তি পেয়েছেন। বাঁদী যতই তাঁর কানে চিৎকার করে বলে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বরাবর হাত-পা ছুঁড়ে মারছিলেন।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের খওফ ততক্ষণ দূর হয় না, যতক্ষণ সে দোযখের পুলকে পেছনে না ফেলে দেয়।

হযরত তাউস (রহঃ)-এর জন্যে বিছানা পাতা হলে তিনি তাতে উত্তপ্ত কড়াইয়ের দানার মত এদিক-ওদিক গড়াগড়ি করতেন। এরপর লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং সকাল পর্যন্ত কেবলার দিকে মুখ করে থাকতেন। তিনি বলতেন ঃ দোযখের বর্ণনা খওফকারীদের নিদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ দোযখ থেকে এক ব্যক্তি এক হাজার বছর পরে মুক্তি পাবে। আমিই সে ব্যক্তি হলে তা হবে আমার সৌভাগ্য। এরূপ বলার কারণ, তিনি অনন্তকাল দোযখবাসের এবং অন্তিমকাল মন্দ হওয়ার ভয় করতেন। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর হাসেননি। রাবী বলেন ঃ আমি যখন তাকে উপবিষ্ট দেখতাম, তখন মনে হত যেন তিনি কয়েদী এবং ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে ধরা পড়েছেন। তিনি ওয়ায করলে মনে হত যেন আখেরাতকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মত তার অবস্থা বর্ণনা করছেন।

ইউনুস সাম্মাক বর্ণনা করেন—আমি এক মজলিসে ওয়ায করলাম। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল ঃ আজ আপনি ওয়াযে এমন একটি বাক্য বলেছেন, যার পর অন্য কিছু না শুনলেও আমাদের পরওয়া ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ বাক্যটি কি? সে বলল ঃ আপনি বলেছেন, অনন্তকাল জান্নাতবাস অথবা অনন্তকাল দোযখবাস খওফকারীদের অন্তর দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছে। ইউনুস সাম্মাক বলেন ঃ অতঃপর যুবক চলে গেল। দ্বিতীয় ওয়াযে আমি তাকে অনুপস্থিত দেখে লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল, সে অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে জওয়াব দিল ঃ হে আবুল আব্বাস, আপনার সে বাক্যের প্রতিক্রিয়াতেই এ অসুস্থতা। এরপর যুবক এ রোগেই মারা গেল। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আপনার বাক্যের দৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন।

সারকথা, পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যখন এতটা খওফ করেছেন, তখন আমাদের খওফ করা আরও বেশী উচিত। এটা জরুরী নয় যে, গোনাহ বেশী হলেই কেবল খওফ করতে হবে; বরং অন্তর পরিষ্কার এবং মারেফত পুরোপুরি হলেও খওফ করাই বাঞ্ছনীয়। অধিক এবাদত ও গোনাহের স্বল্পতা ভয়হীনতা দাবী করে না; বরং ভয়হীনতার কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনার আনুগত্য, দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য এবং অন্তর গাফেল ও কঠোর হওয়ার কারণে নিজের অবস্থা দেখার ব্যাপারে অক্ষমতা। এমন ভয়হীন ব্যক্তি মৃত্যু কাছে এলেও জাগ্রত হয় না, অধিক গোনাহ করেও কম্পিত হয় না এবং মন্দ পরিণামের আশংকাকেও অন্তরে স্থান দেয় না। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলাই নিজ কৃপায় তার অবস্থা শুধরে দেন, তবেই তা সম্ভব। তাই এর জন্যে দোয়া ও কর্মতৎপরতা আবশ্যক। কারণ, শুধু মৌখিক দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যখন দুনিয়াতে ধনী হওয়ার অভিলাষী হই, তখন এর জন্যে কত জরুরী কাজকর্ম সম্পন্ন করি, ক্ষেতে হাল চাষ করি, বীজ বপন করি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের মোকাবিলা করি। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে চাইলে এর জন্যে কত কঠোর সাধনা করি। পড়াশুনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেই। জীবিকার অন্বেষণে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টই না স্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলা রুযীর ওয়াদা দিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকি না। বসে বসে আল্লাহর কাছে আরয করি না যে— ইলাহী! আমাকে রুযী দাও। কিন্তু যখন অনন্ত, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করি, তখন তার জন্যে কেবল মুখে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, ইলাহী! ক্ষমা কর—ইলাহী রহম কর। এর জন্যে যে কঠোর সাধনা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন, সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করি না। অথচ যে সত্তার কাছে আমরা আশাবাদী এবং যার নামে আমরা ধোকায় পড়ে আছি, তিনি নিজে এরশাদ করেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

অর্থাৎ, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করে।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রতারক শয়তান যেন আল্লাহর নামে ধোকা না দেয়।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ, হে মানব, তোমাকে তোমার করুণাময় প্রভুর ব্যাপারে কিসে ধোকায় ফেলে রেখেছে?

এসব উক্তির যে কোন একটি আমাদেরকে আমাদের বিভ্রান্তি ও মিথ্যা আশা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের তওবা কবুল করেন এবং তওবার আগ্রহ আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রোথিত করে দেন। আমরা যেন কেবল মৌখিক তওবা করে ক্ষান্ত না হই। অন্যথায় আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা কথা বলে—কাজ করে না, কানে শুনে—মেনে চলে না এবং ওয়ায শুনে কাঁদে, কাজের সময় গা বাঁচিয়ে চলে।

সপ্তম অধ্যায়

ফক্‌র ও যুহ্‌দ

(দারিদ্র্য ও সংসারবিমুখতা)

দুনিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দুশমন। এর ছলনায় অনেক মানুষ বিপথগামী হয়েছে এবং এর প্রবঞ্চনায় অনেক সাধক সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। দুনিয়ার মোহ যাবতীয় পাপ ও মন্দ কর্মের মূল এবং এর প্রতি বিমুখতা যাবতীয় এবাদত ও আনুগত্যের ভিত্তি। আমরা দুনিয়াপ্রীতির নিন্দা সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে দুনিয়া থেকে বিরত থাকা এবং তার প্রতি বিমুখতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কেননা, উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের মধ্যে এটাই মূল।

দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে মুক্তির আশা করা যায় না। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় দুটি। এক, দুনিয়ার স্বয়ং মানুষের কাছ থেকে আলাদা থাকা, যার নাম "ফক্‌র" তথা দারিদ্র্য এবং দুই, মানুষের দুনিয়া থেকে দূরে অবস্থান করা, যাকে বলা হয় "যুহ্‌দ" তথা সংসারবিমুখতা।

সৌভাগ্য অর্জন এবং সাফল্য ও মুক্তি লাভে সহায়তার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা এতদুভয়ের স্বরূপ, স্তর, শর্ত ও বিধি-বিধান দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্যের স্বরূপ ও ফযীলত

প্রয়োজনীয় বস্তু না থাকার নাম দারিদ্র্য। অপ্রয়োজনীয় বস্তু না থাকাকে দারিদ্র্য বলা হয় না। প্রয়োজনীয় বস্তু বিদ্যমান থাকলে এবং তা মানুষের আয়ত্তে থাকলে সে মানুষকে "ফকীর" তথা দরিদ্র বলা হবে না। একথা জানার পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান সবই দরিদ্র। কেননা, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান বস্তুর নিরন্তর বিদ্যমানতা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার ফল। এই অনুগ্রহ না হলে সে পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হতে পারে না। অতএব, অস্তিত্বের যবনিকায় যদি এমন কেউ থাকে, যার পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়া কারও অনুগ্রহ ও কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে সে হবে সর্বাবস্থায় ধনী। বলা বাহুল্য, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া এরূপ কোন বিদ্যমান বস্তু নেই— হতে পারে না। সুতরাং অস্তিত্বে ধনী একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, সবই ফকীর। এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ পাকের এই উক্তিতে وَاللّٰهُ غَنِىٌّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহই সকল সম্পদের মালিক আর তোমরা তার মুখাপেক্ষী। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ ও সম্যক ফক্‌রের তাৎপর্য।

কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য মানুষের ধন-সম্পদের "ফক্‌র" ও দারিদ্র্য বর্ণনা করা। কারণ, মানুষের প্রয়োজন অসংখ্য ও অগণিত। তন্মধ্যে কতক প্রয়োজন ধন-সম্পদ দ্বারা পূরণ হতে পারে। তাই আমরা এটা বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, যার কাছে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ নেই, তাকে এই ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে ফকীর ও দরিদ্র বলা হয়। ফকীরের অবস্থা পাঁচ প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে।

প্রথম অবস্থা, কারও কাছে ধন-সম্পদ এলে সে তাকে মন্দ বিবেচনায় মনে যন্ত্রণা অনুভব করে, গ্রহণ করা থেকে পলায়ন করে এবং তার অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এরূপ ব্যক্তিকে "যাহেদ" তথা সংসারবিমুখ বলা হয়। এ অবস্থাটি সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় অবস্থা ধন-সম্পদের বাসনা এত প্রবল থাকে না যাতে অর্জিত হলে আনন্দিত হবে এবং এমন ঘৃণাও থাকে না যাতে যন্ত্রণা অনুভব করবে কিংবা পাওয়া গেলে বর্জন করবে। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা "রাযী" তথা তুষ্ট বলে থাকি।

তৃতীয় অবস্থা, ধন-সম্পদ থাকা না থাকার তুলনায় পছন্দনীয়। তাই ধন-সম্পদের বাসনা থাকে। কিন্তু এমন নয় যে, তা লাভ করার জন্য কর্মতৎপর হবে এবং বিনা কায়ক্লেশে পাওয়া গেলে আনন্দিত হয়। এরূপ ব্যক্তিকে "কানে" তথা অল্পে তুষ্ট বলা হয়। কেননা, সে যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে অর্জন থেকে বিরত থাকে।

চতুর্থ অবস্থা, অক্ষমতার কারণে ধন উপার্জন থেকে বিরত থাকে; নতুবা বাসনা এত বেশী যে, উপার্জনের পথ পেলে পরিশ্রম সহকারে হলেও উপার্জনে মত্ত হবে। এরূপ ব্যক্তিকে "হারীছ" তথা লোভী বলা হয়।

পঞ্চম অবস্থা, যে ধন তার কাছে নেই, সেই ধনের ব্যাপারে নিঃসহায় হওয়া; যেমন ক্ষুধাতুরের কাছে অন্ন না থাকা এবং বস্ত্রহীনদের কাছে বস্ত্র না থাকা। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা 'মুযতর' তথা নিঃসহায় বলে থাকি, উপার্জনের ক্ষেত্রে তার আগ্রহ দুর্বল হোক অথবা প্রবল। এ অবস্থাটি খুব কম দোষমুক্ত।

উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থার মধ্যে যুহ্দ উত্তম। এগুলোর উপরে আরও একটি অবস্থা আছে, যা যুহ্দের চেয়েও উত্তম। তাতে ধন-সম্পদ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান হয়। ফলে, ধন এলেও আনন্দ হয় না এবং গেলেও দুঃখ হয় না। হযরত আয়েশার (রাঃ) অবস্থা এমনি ছিল। তাঁর কাছে দান ও উপঢৌকনের কোন দেরহাম আগমন করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং সেদিনই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর পরিচারিকা আরয করল ঃ আজকের দেরহাম থেকে যদি আপনি এক

দেরহামের গোশত আনিয়ে নিতেন, তবে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি বললেন ঃ আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। সুতরাং যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ, জগত সংসারের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তার হাতে থাকলেও তাতে তার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার মনে করে—নিজের নয়। এ জন্যেই ধন-সম্পদ তার হাতে থাকুক অথবা অন্যের হাতে—উভয়টি তার কাছে সমান। এরূপ ব্যক্তিকে আমাদের মতে "মুস্তাগনী" তথা বেপরওয়া বলা সমীচীন। কেননা, সে অর্থ থাকা ও না থাকা উভয়টির ঊর্ধ্বে। যে বিত্তশালী, সে বিত্ত আগমনের ঊর্ধ্বে; কিন্তু বিত্ত তার কাছে থাকুক, এর ঊর্ধ্বে নয়; বরং এর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এদিক দিয়ে বিত্তশালী ফকীর বটে। কিন্তু যে বেপরওয়া, সে অর্থের আগমন, তার কাছে থাকা এবং তার হাত থেকে চলে যাওয়া ইত্যাদি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। এ কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার "গনী" গুণের অধিক নিকটবর্তী।

এ ধরনের বান্দা ধন-সম্পদ থাকা না থাকার ব্যাপারে বেপরওয়া হলেও অন্য কোন ব্যাপারে বেপরওয়া নয়। সে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের ব্যাপারে বেপরওয়া নয়, যার ফলে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেপরওয়া হতে পেরেছে। এই বেপরওয়া অবস্থাটি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নেয়ামত। কারণ, যে অন্তর ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন, সে গোলাম এবং যে এ থেকে বেপরওয়া সে মুক্ত, আযাদ। আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ গোলামী থেকে মুক্ত করেন।

সারকথা, দারিদ্র্যের অবস্থা ও স্তর ছয়টি। তন্মধ্যে মুস্তাগনীর স্তর সর্বোচ্চ, এরপর যাহেদ, এরপর রাযী, এরপর কানে এবং এরপর হারীছ। মুযতর যাহেদ, রাযী ও কানে হতে পারে। সুতরাং অবস্থাভেদে তার স্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে। কিন্তু মুস্তাগনী ছাড়া সকলকে ফকীর বলা যায়। মুস্তাগনী ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তবে নিজের বেপরওয়া অবস্থার জন্যে সে আল্লাহর তাওফীকের মুখাপেক্ষী বিধায় তাকে ফকীর বলা হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ বলে দারিদ্র্য

থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং অন্য এক হাদীসে বলেছেন—

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

এ উক্তির মধ্যেও দারিদ্র্যের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর দরবারে এই বলে মোনাজাত করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ এবং মিসকীনরূপে মৃত্যু দান কর।

এই দোয়ায় দারিদ্র্যের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা উপরে দারিদ্র্যের যে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পেশ করেছি, সেমতে হাদীসের উভয় প্রকার বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, যে দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে মুযতর তথা নিঃসহায় ব্যক্তির দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য পর্যায়ক্রমে কুফরে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। পক্ষান্তরে যে দারিদ্র্যের তিনি প্রার্থনা করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আপন অসহায়ত্ব, অপমান ও মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করা। অতএব, হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার স্ববিরোধিতা নেই।

দারিদ্র্যের ফযীলত ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ, সে সব ফকীর ও দেশত্যাগীদের জন্যে, যারা নিজের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি

অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ, সে ফকীরদেরকে দেবে, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ। তারা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করতে সক্ষম নয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশংসার স্থলে ফকীরকে মোহাজির গুণের পূর্বে এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর পথে আবদ্ধ গুণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্রগণ্যতার মাধ্যমে ফক্‌রের প্রশংসা বুঝা যায়।

হাদীস দ্বারাও ফক্‌রের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন- সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তারা আরয করলেন ঃ যে ধনী এবং নিজের ধন থেকে আল্লাহর হক আদায়কারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এ ব্যক্তি উত্তম! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সে নয়। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ তা হলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম! তিনি বললেন ঃ فَقِيْرٌ يُعْطِىْ جُهْدَهٗ যে ফকীর তার আয়াসলব্ধ বস্তু দান করে।

রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত বেলালকে বললেন ঃ

اِلْقَ اللّٰهَ فَقِيْرًا وَ لَا تَلْقَهٗ غَنِيًّا

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে ফকীর হয়ে সাক্ষাৎ কর—ধনী হয়ে নয়।

এক হাদীসে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন ছা-পোষা ফকীরকে পছন্দ করেন, যে সওয়াল করে না।

আরও এরশাদ হয়েছে—

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ

অর্থাৎ, আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ বছর পূর্বে বর্ণিত রয়েছে। এতে মনে হয়, লোভী ফকীর লোভী ধনীর চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংসারবিমুখ ফকীর সংসারাসক্ত ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ থেকে বুঝা যায়, লোভী ফকীর এবং যাহেদ ফকীরের মাঝে স্তরের পার্থক্য সাড়ে বার গুণ। কেননা, পাঁচশ' চল্লিশের সাড়ে বার গুণ বেশী। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, তা অর্থহীন কথার ন্যায় এমনিতেই মুখে উচ্চারিত হয়ে গেছে। বরং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে প্রকৃত সত্যই বর্ণনা করেছেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فُقَرَاءُهَا وَاَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاءُهَا

অর্থাৎ, ফকীর হচ্ছে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর এই উম্মতের দুর্বলরা দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اِنَّ لِي حِرْفَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِي الْفَقْرُ وَالْجِهَادُ –

অর্থাৎ, আমার দুটি পেশা—ফকীরী ও জেহাদ। যে এ দুটিকে পছন্দ করবে, সে আমাকে পছন্দ করবে, আর যে এ দুটিকে অপছন্দ করবে, সে আমাকে অপছন্দ করবে।

একবার জিবরাঈল (আঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন ঃ হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি যদি এই পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে আপনার অধিকারভুক্ত করে দেন, তবে আপনি তা পছন্দ করবেন কি না? রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করে থেকে বললেন ঃ হে জিবরাঈল!

اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ لِمَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالٌ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

অর্থাৎ, যার ঘর নেই দুনিয়া তার ঘর, যার অর্থ-সম্পদ নেই, দুনিয়া তার অর্থ-সম্পদ আর যার বোধশক্তি নেই, সে দুনিয়া সঞ্চয় করে।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) জনৈক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করেন। সে চাদর জড়িয়ে ঘুমুচ্ছিল। তিনি তাকে জাগিয়ে বললেন ঃ হে ঘুমন্ত ব্যক্তি, উঠ এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। সে বলল ঃ আপনি আমার কাছে কি চান? আমি দুনিয়া বিসর্জন দিয়েছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ হে বন্ধু, তা হলে ঘুমো।

আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ঘরে মেহমান আগমন করল। তখন তাঁর কাছে মেহমানের আতিথেয়তার জন্যে কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খয়বরের এক ইহুদীর কাছে পাঠিয়ে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন রজব মাসের মেয়াদে আমাকে আটা কর্জ দেয় অথবা বিক্রি করে তার মূল্য। নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করব। আমি ইহুদীকে এ কথা বললে সে বলল ঃ আমি বন্ধক ছাড়া দেব না। আমি ফিরে এসে এ কথা আরয করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জেনে রাখ, আমি আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ত। সে আমাকে কর্জ দিলে অথবা বিক্রি করে তার মূল্য দিলে আমি অবশ্যই তা শোধ করতাম। যাও, আমার লৌহবর্ম তার কাছে বন্ধক রেখে এস। আমি বের হতেই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى –

অর্থাৎ, আপনি দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না সে সম্পদের প্রতি, যা আমি নানা প্রকার লোকদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। আপনার পালনকর্তার রিযিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনকে দুনিয়ার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ কোন এক পয়গম্বর নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে মৎস্য শিকার করতে দেখলেন। সে "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। কিন্তু একটি মাছও ধরা পড়ল না। অতঃপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে "বিসমিশ্ শয়তান" (শয়তানের নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। তার জালে এত মাছ এল যে, সে ধরে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! ব্যাপার কি? আমি জানি, সবকিছুই আপনার কুদরতের অধীন। কিন্তু এ কি দেখলাম? আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন আমার বান্দাকে এই দুই শিকারীর মর্তবা দেখিয়ে দাও। পয়গম্বর যখন প্রথম শিকারীর বুযুর্গী ও মাহাত্ম্য এবং দ্বিতীয় শিকারীর লাঞ্ছনা ও অবমাননা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন ঃ ইলাহী! আমি বুঝে ফেলেছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে ফকীর দেখেছি এবং দোযখে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ লোককে ধনী ও মহিলা দেখেছি। হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে— পয়গম্বরগণের মধ্যে সবার পেছনে হযরত সোলায়মান (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এর কারণ তাঁর সাম্রাজ্য। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পরে জান্নাতে যাবেন। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—ধনী ব্যক্তি খুব পরিশ্রম সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইলাহী! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার বন্ধু কারা? আমিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। উত্তর হল ঃ প্রত্যেক ফকীর ও অভাবগ্রস্ত লোক আমার বন্ধু।

একবার আরবের গোত্রপতি ও ধনী ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাদের জন্যে একদিন এবং ফকীরদের জন্যে একদিন নির্দিষ্ট করে দিন। যেদিন তারা আপনার কাছে আসবে, সেদিন আমরা আসব না। আর যেদিন আমরা আসব, সেদিন তারা আসতে

পারবে না। বলা বাহুল্য, ফকীর বলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত বেলাল, সালমান ফারেসী, সোহায়ব রূমী, আবুযর গেফারী, খাব্বাব ইবনে ইরত, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু হুরায়রা প্রমুখ নিঃস্ব ব্যক্তিবর্গ। দারিদ্র্যের কারণে তারা পশমের পোশাক পরতেন। তীব্র গরমের দিনে তাদের ঘর্মাক্ত পোশাক থেকে দুর্গন্ধ বের হত। এটাই ছিল উদ্ধত ধনীদের নাক ছিটকানোর প্রধান কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলে দিলেন ঃ আচ্ছা, আমি তাই করব। একই মজলিসে তোমাদেরকে একত্রিত করব না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ অবতীর্ণ হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ফকীরদের সাথে থাকুন— ধনীদের আনুগত্য করবেন না।

অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে জনৈক কোরায়শ সরদার উপস্থিত ছিল। এমন সময়ে ইবনে উম্মে মাকতুমের সেখানে আসা এবং প্রবেশের অনুমতি চাওয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অপ্রিয় মনে হয়। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى -

অর্থাৎ, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। কে আপনাকে তার সম্পর্কে অবগত করল। সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর এ উপদেশ তাকে উপকৃত করত। আর যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ফকীরকে ডেকে এমনভাবে উযরখাহী করবেন, যেমন মানুষ একে অপরের সাথে উযরখাহী করে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়াকে তোমার কাছ থেকে এজন্যে বিচ্ছিন্ন রাখিনি যে, তুমি আমার কাছে হেয় ছিলে; বরং এর কারণ ছিল এই যে, এখানে তোমার জন্যে সম্মান ও মাহাত্ম্য মওজুদ রেখেছিলাম। এখন তুমি এই কাতারগুলোতে যাও এবং সে ব্যক্তিকে চিনে নাও, যে দুনিয়াতে একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাকে অন্ন দিয়েছে এবং বস্ত্র দিয়েছে। তুমি তার হাত ধরে নাও। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমি তোমাকে দিলাম। তখন মানুষ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকবে। এই ব্যক্তি কাতার চিরে চিরে দেখবে, তার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে। যাকে এরূপ পাবে, তার হাত ধরে সে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— ফকীরদেরকে ভাল করে চিনে নিও এবং তাদের কাছ থেকে নেয়ামত হাসিল করো। কেননা, তাদের কাছে ধন আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তাদের কাছে কি ধন আছে? উত্তর হল— কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে—দেখ, যে তোমাদেরকে এক মুঠো খাদ্য দিয়েছে অথবা এক চুমুক পানি দিয়েছে অথবা বস্ত্র দিয়েছে, তার হাত ধর এবং জান্নাতে পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আমার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। একদিন তিনি বললেন ঃ আমি তোমার ইযযত করি। আমি আমার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে দেখতে যাব। সে অসুস্থ। আমি আরয করলাম। ভাল কথা চলুন। তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হযরত ফাতেমার ঘরের দরজায় পৌঁছে তিনি দরজায় টোকা দিয়ে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমি ভেতরে আসতে পারি কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আব্বাজান, আপনি আসুন। তিনি বললেন ঃ আমি এবং আমার সাথী উভয়েই আসব কি? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সাথী কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ এমরান। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন—এখন আমার গায়ে একটি কম্বল ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ কম্বলটি এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেহ আবৃত করেছি; কিন্তু মাথা কি দ্বারা আবৃত করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গায়ে একটি পুরাতন চাদর ছিল। তিনি তা কন্যার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি দিয়ে মাথা বেঁধে নাও। এভাবে তিনি গা ও মাথা আবৃত করার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আসসালামু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাছা, সকালে তোমার অবস্থা কেমন ছিল? উত্তর হল ঃ আমি ব্যথায় আক্রান্ত ছিলাম। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, আমার কাছে খাওয়ারও কিছু নেই। আমি ক্ষুধায় কষ্ট করছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ বাছা, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমিও তিন দিন ধরে কিছু খেতে পাইনি। আল্লাহ্ আমার ইযযত তোমার চেয়ে বেশী দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করলে তিনি আমাকে খাওয়াতেন, কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর তিনি নিজের হাত হযরত ফাতেমার (রাঃ) কাঁধে রেখে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, তুমি জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী। তিনি আরয করলেন ঃ ফেরাউন-পত্নী আসিয়া এবং এমরান-তনয়া মরিয়মের মর্তবা কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আসিয়া তার সময়কার মহিলাদের নেত্রী, মরিয়ম তার সময়কার, খাদীজা তার সময়কার এবং তুমি তোমার সময়কার মহিলাদের নেত্রী। তোমরা সকলেই এমন ঘরে থাকবে, যা পান্না নির্মিত অথবা পদ্মরাগ মণি খচিত হবে। এতে কোন প্রকার কষ্ট, শোরগোল ও ক্লান্তি নেই। তিনি আরও বললেন ঃ আমার পিতৃব্য পুত্র আলীকে নিয়েই তুষ্ট থাক। আমি তোমার

বিবাহ এমন ব্যক্তির সাথে দিয়েছি, যে দুনিয়াতেও সরদার এবং আখেরাতেও সরদার।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষ তাদের ফকীরদের খারাপ মনে করতে থাকবে, নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে থাকবে এবং অর্থ সঞ্চয়ে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চারটি বিপদের লক্ষ্যস্থল করে দেবেন—প্রথম দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় যুলুম ও অবিচার, তৃতীয় শাসকবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চতুর্থ শত্রুদের জোর।

ফকীর শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মহাজ্ঞানীদের উক্তিও অনেক বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ এক দেরহামওয়ালার তুলনায় দু' দেরহামওয়ালা কঠিনতম হিসাবের সম্মুখীন হবে।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একবার সাঈদ ইবনে আমরের কাছে এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বিষণ্ন মনে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, নতুন কোন ঘটনা ঘটল নাকি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও গুরুতর ঘটনা। তোমার পুরাতন ওড়নাটি আমাকে দাও। ওড়না আনা হলে তিনি সেটি ছিঁড়ে থলে তৈরি করলেন এবং তাতে দীনারগুলো ভরে বন্টন করে দিলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং ভোর পর্যন্ত ক্রন্দন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমনকি, যদি কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায়, তাকে হাত ধরে বের করে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে বেহিসাব প্রবেশ করবে—এক, যে ব্যক্তি আপন কাপড় ধুতে চাইলে পরার জন্যে অন্য কাপড় থাকে না। দুই, যার চুলায় দু' পাতিল চড়ে না এবং তিন, কেউ পানি চাইলে জিজ্ঞেস করা হয় না যে, কোন্ পানি চাও? অর্থাৎ, যাদের পানাহার ও পোশাকে প্রাচুর্য ও লৌকিকতা নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত সুফিয়ান ছওরীর মজলিসে আগমন করলে তিনি তাকে বললেন ঃ এস, আমার কাছে এস। তুমি ধনী হলে আমি কাছে ডাকতাম না। তাঁর ভক্তদের মধ্যে যারা ধনী ছিল, তারা কামনা করত, হায়! আমরাও যদি ফকীর হতাম! কারণ, তিনি ফকীরদেরকে অধিক পরিমাণে কাছে বসাতেন এবং ধনীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

মুসেল (রহঃ) বলেন ঃ আমি ধনীকে তাঁর মজলিসে যতটা হেয় দেখেছি, ততটা কোথাও দেখিনি। তাঁর দরবারে ফকীরের যে সম্মান ও ইযযত দেখেছি, তা আর কোথাও নজরে পড়েনি।

জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ বেচারী মানুষ যদি দোযখকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু ফকীরীকে ভয় করে, তবে উভয়টি থেকেই মুক্তি পেয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি জান্নাতের আগ্রহ সেই পরিমাণে করত, যে পরিমাণে ধনাঢ্যতার আগ্রহ করে, তবে উভয়টিই হাসিল হয়ে যেত। আর যদি অন্তরে আল্লাহকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু দৃশ্যত মানুষকে ভয় করে, তবে উভয় জাহানে সৌভাগ্যশালী হয়ে যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধনীত্বের কারণে কারও সম্মান করে এবং ফকীরীর কারণে কাউকে হেয় মনে করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান একদিন তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বাছা, পুরাতন ছেঁড়া পোশাক দেখে কাউকে হেয়জ্ঞান করো না। কেননা, তোমার ও তার পালনকর্তা একজন-ই।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ ফকীরদের মহববত পয়গম্বরগণের অন্যতম অভ্যাস এবং তাদের সাথে উঠাবসা সৎকর্মশীল হওয়ার পরিচায়ক। আর তাদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা মোনাফেকির অন্যতম লক্ষণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি একদিনে লাখ লাখ দেরহাম বন্টন করে দিতেন। এসব দেরহাম তিনি হযরত মোয়াবিয়া, ইবনে আমের প্রমুখের কাছ থেকে পেতেন। অর্থকড়ির এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর ওড়না ছিল তালিযুক্ত। তাঁর পরিচারিকা বলতো, আপনি এক দেরহামের গোশ্ত আনিয়ে নিলে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি এর জওয়াবে বলতেন— আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর এই বিমুখতার কারণ ছিল এই যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে ওসিয়ত করেছিলেন, আয়েশা! যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে

ফকীরের মত জীবন নির্বাহ করবে এবং ধনীদের কাছে বসবে না। তালি না লাগা পর্যন্ত নিজের ওড়না বাদ দেবে না।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে এক হাজার দেরহাম পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। লোকটি অনেক পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও, দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে আমার নাম ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়ুক। আমি কখনও তা হতে দেব না।

সত্যবাদী ও অল্পে তুষ্ট লোকদের দারিদ্র্য ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كِفَافًا وَقَنَعَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি সুখী, যে ইসলামের পথপ্রাপ্ত হয়েছে, যার জীবন যাপন প্রয়োজন মাফিক এবং সে এতে সন্তুষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضٰى مِنْ قُلُوْبِكُمْ تَظْفَرُوْا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا

অর্থাৎ, হে ফকীর সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন কর। এতে তোমরা তোমাদের দারিদ্র্যে সওয়াব লাভে সাফল্যমণ্ডিত হবে— নতুবা নয়।

প্রথম হাদীস দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যক্তির ফযীলত জানা যায় এবং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা দারিদ্র্যে সম্মত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। দ্বিতীয় হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয়, লোভী ব্যক্তি দারিদ্র্যের সওয়াব পায় না। সম্ভবত এখানে লোভীর অর্থ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়া না দেয়ার কাজকে মন্দ মনে করে। এই মন্দ মনে করার কারণে সে দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত উমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি চাবি আছে। জান্নাতের চাবি হচ্ছে মিসকীনদের মহব্বত। ধৈর্যশীল ফকীর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সহচর হবে। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম বান্দা, যে আল্লাহর দেয়া রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে। এক হাদীসে বলা হয়েছে।

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِىٍّ اَوْ فَقِيْرٍ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ كَانَ اُوْتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, প্রত্যেক ধনী ও ফকীর কিয়ামতের দিন বাসনা করবে যে, দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ পেলেই ভাল হত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মনোনীত বান্দারা কোথায়? ফেরেশতারা আরয করবে, ইলাহী! আপনার মনোনীত বান্দা কারা? উত্তর হবে—মুসলমান ফকীর, যারা আমার দানে তুষ্ট এবং আদেশে সম্মত। তাদেরকে জান্নাতে দাখিল কর। সুতরাং তারা জান্নাতে খাওয়া-পরা করবে, আর অন্যরা হিসাব-নিকাশে আটকে থাকবে।

অল্পে তুষ্টির বিপরীত হচ্ছে লালসা। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লালসা হচ্ছে অভাবগ্রস্ততা এবং মানুষের কাছ থেকে নৈরাশ্য হচ্ছে ধনাঢ্যতা। যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পত্তি আশা করে না, সে ধনী হয়ে যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। কারণ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়। অথচ দিবারাত্রির চক্র তার আয়ুকে অনবরত করাত দিয়ে কাটতে থাকে, সে জন্য সে দুঃখিত হয় না। আরে হতভাগা! আয়ুষ্কাল কমে গেলে ধন-সম্পদের বৃদ্ধি কি কাজে আসবে?

বর্ণিত আছে, ইবরাহীম ইবনে আদহাম খোরাসানের ধনকুবের ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি নিজ প্রাসাদের জানালা পথে নিচে তাকিয়ে দেখলেন প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি একটি রুটি খাচ্ছে। খাওয়া শেষ

হয়ে গেলে লোকটি সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ইবরাহীম তাঁর চাকরকে বললেন ঃ এই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। চাকর তাই করল। লোকটি সামনে এলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সেই রুটিটি খেয়েছিলে? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এতেই তৃপ্ত হয়ে গেছ? এরপর পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়েছ? লোকটি উত্তর দিল ঃ হাঁ। ইবরাহীম মনে মনে বললেন ঃ মন যখন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে আমি কি করব?

জনৈক ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল কায়েসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন লবণ ও শাক খাচ্ছিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকু নিয়েই কি তুষ্ট হয়ে গেছেন? আমের বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে এর চেয়ে নগণ্য বস্তু নিয়ে রাযী হয়েছে। সে সেই ব্যক্তি, যে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া নিয়ে তুষ্ট হয়।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' শুকনা রুটি বের করতেন এবং পানিতে ভিজিয়ে লবণ দিয়ে খেয়ে নিতেন। তিনি বলতেন— যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকুতে রাযী হয়ে যায়, সে কারও মুখাপেক্ষী হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলতেন—আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করুন, যাদের জন্যে তিনি কসম খেয়েছেন; কিন্তু তারা তাঁর উক্তিকে সত্য জ্ঞান করে না। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু প্রতিশ্রুত। অতএব, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভুর শপথ, এটা অবশ্যই সত্য।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) একদিন জনসমাবেশে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে বললেন— আপনি এখানে লোকজনের মধ্যে বসে আছেন, অথচ ঘরে যে খাবার বলতে কিছু নেই! তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আমাদের সামনে একটি দুর্গম উপত্যকা রয়েছে। সেখানে সেই

আত্মরক্ষা করতে পারবে, যে হালকা হবে। তাঁর পত্নী একথা শুনে খুশী হয়ে চলে গেলেন।

হযরত উসমান যুন্নুরাইন (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপবাসে সবর করে না, সে কুফরের অধিক নিকটবর্তী।

ধনাঢ্যতার বিপরীতে দরিদ্রতার ফযীলত ঃ এ সম্পর্কে নানা মনীষীর নানা মত। হযরত জুনায়দ, খাওয়াস প্রমুখসহ অধিকাংশ বুযুর্গ দরিদ্রতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন। কিন্তু ইবনে আতা বলেন, যে শোকরকারী ধনী সব রকম হক আদায় করে, সে সবরকারী দরিদ্র অপেক্ষা উত্তম। এই বিরুদ্ধ মত পোষণ করার কারণে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া দেন।

কিন্তু ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও মহাজ্ঞানীদের উক্তি থেকে তাই জানা যায়। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, দুটি জায়গায় সন্দেহ থেকে যায়। প্রথমত, যে সবরকারী ফকীর অর্থোপার্জনের লোভ করে না, তাকে অর্থ খয়রাতকারী ও অর্থ আটকে রাখার ব্যাপারে নির্লোভ ধনীর বিপরীতে দেখলে ধারণা হয়, ধনী ফকীরের তুলনায় উত্তম। কেননা, অর্থের লোভ উভয়ের মধ্যে কম। এতে তারা সমান সমান; কিন্তু ধনী সদকা-খয়রাত করে সওয়াব হাসিল করে, যা ফকীরের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, লোভী ফকীরকে লোভী ধনীর বিপরীতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, ধনী উত্তম।

আমাদের মতে এ দুটি জায়গায়ই ইবনে আতার বক্তব্য লক্ষণীয়। কিন্তু যে ধনী ধন-সম্পদ উপভোগ করে, তা বৈধ পন্থায় করলেও সে নির্লোভ ফকীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এর দলীল হাদীসে বর্ণিত এই রেওয়ায়েত যে, একবার ফকীররা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল— ধনীরা দান-খয়রাত, সাদাকাত, হজ্জ ও জেহাদে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ওযীফা হিসাবে কয়েকটি কলেমা শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এসব কালেমা পাঠ করলে তোমরা ধনীদের তুলনায় বেশী সওয়াব পাবে। এরপর ধনীরাও টের পেয়ে এসব কালেমা শিখে নিল এবং পড়তে শুরু করল। ফকীররা পুনরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ এখন তো ধনীরাও এসব কালেমা পড়তে শুরু করেছে। এখন কি করা যায়? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, এটি হল আল্লাহর কৃপা। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এ থেকে বাহ্যত ধনীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও বর্ণিত আছে। তা এই যে, তাসবীহ পাঠে ফকীরের সওয়াব ধনীর সওয়াবের চেয়ে বেশী এবং এটা আল্লাহ তা'আলার কৃপা, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। অর্থাৎ, হাদীসে ذلى (এটা) বলে ফকীরের সওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—ধনীর সওয়াবের দিকে নয়।

এই ব্যাখ্যার সপক্ষে যায়েদ ইবনে আসলামের একটি রেওয়ায়েত, যা তিনি আনাস ইবনে মালেকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন— তা পেশ করা হল। সে হাদীসে আছে যে, ফকীররা এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠাল। সে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ফকীরদের প্রেরিত দূত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাকেও মারহাবা এবং যাদের কাছ থেকে এসেছ, তাদেরকেও মারহাবা। তাদেরকে আমি পছন্দ করি। দূত আরয করল ঃ ধনী হজ্জ করে—আমরা করতে পারি না। তারা ওমরা করে —আমাদের ক্ষমতা নেই। তারা অসুস্থ হলে তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে। এভাবে সমস্ত সওয়াবই তারা নিয়ে যায়। ফকীররা সওয়াব হাসিল করতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ ফকীরদেরকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও—তোমাদের যে কেউ সবর করবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশী হবে, তার জন্যে তিনটি বিষয় অর্জিত হবে, যা ধনীদের অর্জিত হবে না। প্রথম এই যে, জান্নাতে অনেক খিড়কী হবে, যেগুলো জান্নাতবাসীরা এমনভাবে দেখবে, যেমন পৃথিবীর লোক আকাশের তারকাকে দেখে। এই খিড়কীদার জান্নাতে পয়গম্বর ফকীর, শহীদ ফকীর এবং ঈমানদার ফকীর ছাড়া কেউ যাবে না। দ্বিতীয়ত, ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। তৃতীয়ত, ধনী যখন বলে সোবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর এবং ফকীরও তাই বলে, তখন ধনী ফকীরদের সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যদিও দশ হাজার দেরহাম খয়রাত করে। অন্যান্য সৎকর্মকেও এমনি মনে করা উচিত। দূত একথা শুনে ফিরে এল এবং ফকীরদেরকে অবহিত করল। তারা সমস্বরে বলে উঠল ঃ আমরা রাযী, আমরা নিরুদ্বেগ। এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ বলে ফকীরদের সওয়াব বেশী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করলেও ফকীর বিপদাশংকা থেকে অধিকতর দূরে থাকে। কেননা, ধনাঢ্যতার ফেতনা নিঃস্বতার ফেতনা থেকে অধিক তীব্র হয়ে থাকে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা নিঃস্বতার ফেতনায় সবর করে বেঁচে গেলাম। কিন্তু ধনাঢ্যতার ফেতনায় সবর করতে পারলাম না। এটা প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। খুব কম লোকই এ থেকে মুক্ত। শরীয়তের বিধান বিরল ব্যক্তিদের জন্যে নয়; বরং সকলের জন্যে। নিঃস্বতা সকলের জন্যে উপযোগী— যদিও বিরল ব্যক্তির জন্যে নয়; তাই শরীয়ত ধনাঢ্যতার নিন্দা করেছে এবং দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করেছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—দুনিয়াদারদের ধন-দৌলতের দিকে তাকিও না। তাদের ধন-দৌলতের চাকচিক্য তোমার ঈমানের নূরকে বিলীন করে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ ধন-দৌলতের আগমন ঈমানের মিষ্টতা হরণ করে। হাদীসে আছে— প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি গোবৎস আছে। আমার উম্মতের গোবৎস হচ্ছে দেরহাম ও দীনার। ইহুদীদের গোবৎসও স্বর্ণ ও রূপার অলংকার দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

সারকথা, অর্থ ও পানি এবং স্বর্ণ ও পাথর সমান হওয়া ওলী ও পয়গম্বরগণের বেলায় সম্ভব। তারাও এটা পূর্ণরূপে তখন অর্জন করেন, যখন আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্তর মোজাহাদা ও সাধনা করে নেন। সেমতে দুনিয়া যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সুসজ্জিত ও কামনার মূর্তি হয়ে ধরা দিত, তখন তিনি দুনিয়াকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে দূরে থাক। হযরত আলী (রাঃ) বলতেন ঃ হে চকচকে সোনা, যা অন্য কাউকে ধোকা দে এবং হে ধবধবে রূপা, যা অন্য কারও সাথে ছলনা কর। তিনি যখন মনে দুনিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার প্ররোচনা অনুভব করতেন, তখন উপরোক্ত বাক্য বলতেন। অন্তরে ধন ও পানির মূল্য সমান হওয়াকে বলা হয় "গিনায়ে মুতলক" তথা ধনাঢ্যতা। হাদীসে আছে—অন্তরের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা—সম্পদের ধনাঢ্যতা নয়। শেখ সা'দী এর তরজমা করে বলেন—তাওয়াঙ্গরী বদিল আস্ত, না বমাল। যেহেতু এটা সুকঠিন, তাই

ধন-সম্পদ না থাকার মধ্যেই সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকা উচিত, যদিও ধন-সম্পদ থাকে তা কেবল দান-খয়রাতের মধ্যেই ব্যয় করে। কেননা, ধন-সম্পদ হাতে এলে তার প্রতি টান সৃষ্টি হওয়া এবং তা সুখের জন্যে ব্যয় করার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে, ইহজগতের মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং পরজগতের প্রতি অনীহা আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের কারণসমূহ অপসারিত হয়ে গেলে অন্তরও দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্তর আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। কেননা, অন্তর কোন সময় খালি থাকে না। যে অন্তর গায়রুল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে অন্তর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর যে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে গায়রুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। অন্তর যে পরিমাণে একদিকে ধাবিত হবে, সে পরিমাণে অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে এবং যতটুকু একদিকের নিকটবর্তী হবে, ততটুকু অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি তার অন্তরের দিকেই থাকা উচিত যে, সে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয় কিনা? তার প্রতি আসক্ত হয় কিনা? মোটকথা,অর্থ-সম্পদের সাথে অন্তরের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই ধনী ও দরিদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়।

সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ধনাঢ্যতা অর্জিত হওয়া যখন অসম্ভব অথবা অত্যন্ত দুরূহ, তখন একথা বলাই সঙ্গত যে, সাধারণ মানুষের জন্যে দারিদ্র্যই উত্তম। কেননা, দুনিয়ার সাথে ফকীরের সম্পর্ক ও টান কম থাকে। এ সম্পর্ক যত দুর্বল হয়, ততই তাসবীহ ও এবাদতের সওয়াব বেশী হয়। কেননা, তাসবীহের উদ্দেশ্য শুধু জিহ্বার নড়াচড়া নয়; বরং যার তাসবীহ পাঠ করা হয়, তার সাথে সম্পর্ক গাঢ় হওয়াই উদ্দেশ্য। এ কারণেই জনৈক মনীষী বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়া অন্বেষণে রত অবস্থায় বৈরাগ্য ও এবাদত করে, সে এমন, যেমন কেউ খড়-কুটা দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করতে চায়। হযরত সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কামনা-বাসনামুক্ত অবস্থায় ফকীরের শ্বাসগ্রহণ ধনীর হাজার বৎসরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে পছন্দের বস্তু দেখে, অতঃপর সবর করে ও সওয়াবের প্রত্যাশা করে, এটা তার জন্যে আল্লাহর পথে হাজার দীনার ব্যয় করা অপেক্ষা শ্রেয়!

জনৈক ব্যক্তি বশীর ইবনে হারেসকে বলল ঃ আপনি আমার জন্যে

দোয়া করুন, পরিবারের লোকজন আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার পরিবারের লোকজন আটার রুটি নেই বলে অভিযোগ করতে থাকে, তখন তুমি আমার জন্যে দোয়া করো। কেননা, তোমার সেই সময়কার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধনীদের মুখ থেকে মারেফাতের কথা শুনা পছন্দ করতেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الذُّلَّ عِنْدَ الْمُتَعَنِّفِ مِنْ نَفْسِىْ وَالزُّهْدَ فِيْمَا جَاوَزَ الْكِفَافَ -

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার নফস যখন পূর্ণ হক চায়, তখন আমি তোমার কাছে অপমান প্রার্থনা করি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তোমার কাছে বৈরাগ্য প্রার্থনা করি।

হযরত আবু বকর ছিলেন কামেল ও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ। তিনিই যখন দুনিয়াকে ভয় করেছেন, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ধন-সম্পদ না থাকা. থাকার চেয়ে শ্রেয়।

এছাড়া ধনীর অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তম অবস্থা হালাল উপার্জন করা এবং সৎকাজে ব্যয় করা। এ সত্ত্বেও কিয়ামতের মাঠে তার হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হবে এবং অনেক সময় আটকে থাকতে হবে। হাদীস অনুযায়ী সে হিসাবের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে পড়বে, সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। এ কারণেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমার দোকান মসজিদের দরজায় অবস্থিত হয়, ফলে কোন নামায ফওত না হয় এবং প্রত্যহ পঞ্চাশ দীনার করে লাভ হয়, যা আমি আল্লাহর পথেই ব্যয় করি, তবু আমি এটাকে পছন্দ করব না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এতে খারাপ কি দেখলেন ঃ তিনি বললেন ঃ হিসাব-নিকাশের দীর্ঘসূত্রতা।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীররা তিনটি বিষয় এবং ধনীরা তিনটি বিষয় পছন্দ করেছে। ফকীরদের পছন্দ করা বিষয়গুলো হচ্ছে— মনের প্রশান্তি, অন্তরের ঝামেলামুক্ততা এবং হিসাব-নিকাশের দ্রুততা। পক্ষান্তরে ধনীদের পছন্দ করা তিনটি বিষয় হচ্ছে— মানসিক কষ্ট, অন্তরের ব্যাপৃত থাকা এবং হিসাব-নিকাশ কঠোর হওয়া।

এ পর্যন্ত অল্পেতুষ্ট ফকীর ও শোকরকারী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন লোভী ফকীর ও লোভী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, তাদের মধ্যে উত্তম কে?

মনে কর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অভিলাষী এবং সেজন্য চেষ্টাচরিত্রও করে, কিন্তু ধন-সম্পদ পায় না। এরপর ঘটনাচক্রে সে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গেল। এ ব্যক্তি লোভী ফকীর এবং লোভী ধনী উভয় বিশেষণে বিশেষিত। তার এ দুটি বিশেষণের মধ্যে কোন্ বিশেষণটি উত্তম, তাই দেখতে হবে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এ ব্যক্তি যদি এতটুকু ধন-সম্পদের অভিলাষী হয়, যতটুকু জীবিকা ও জীবনের জন্যে জরুরী এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ধর্মের পথ অতিক্রম করা ও তাতে সাহায্য নেয়া, তবে তার জন্যে ধন-সম্পদ থাকা উত্তম। কেননা, দারিদ্র্য জীবিকা অন্বেষণে ব্যাপৃত রাখে, ফলে যিকির ও এবাদত ঠিকমত হতে পারে না। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের খাদ্য ততটুকু কর, যতটুকু জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরের নিকটবর্তী।

এখানে দারিদ্র্য অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুপস্থিতি।

পক্ষান্তরে যদি প্রার্থিত ধন-সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় অথবা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হয় কিন্তু উদ্দেশ্য ধর্মের কাজে সাহায্য নেয়া না হয়, তবে দারিদ্র্যাবস্থাই উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে অর্থের লোভ ও ধন-সম্পদের মোহে ফকীর ও ধনী উভয়েই সমান এবং ধর্মের কাজে সাহায্য না নেয়ার মধ্যেও সমান। কিন্তু পার্থক্য এই, যার কাছে ধন-সম্পদ থাকবে, তার মনে ধনের মহব্বত থাকবে আর যার কাছে থাকবে না, তার মন এই মহব্বত থেকে মুক্ত থাকবে। দুনিয়া তার কাছে কয়েদখানার মত মনে হবে, যা থেকে সে নিষ্কৃতি চাইবে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর সময় যার মন দুনিয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকবে, তার অবস্থা অপরের চেয়ে খারাপ

হবে। হাদীস শরীফে আছে, পবিত্রাত্মা আমার মনে একথা বদ্ধমূল করেছেন যে, اَحْبِبْ مَنْ اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ অর্থাৎ, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করে নাও। তোমাকে তার কাছ থেকে অবশ্যই পৃথক হতে হবে।

এতে বুঝানো হয়েছে যে, প্রিয়জনের বিরহ অত্যন্ত কঠিন। অতএব এমন ব্যক্তিকে বন্ধু করা উচিত, যে কখনও পৃথক হয় না। বলা বাহুল্য, সে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা।

ফকীরের আদব ঃ ফকীরের জন্যে অন্তরে, বাইরে, লোকের সাথে মেলামেশায় এবং স্বীয় কাজেকর্মে কয়েকটি আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। অন্তরের আদব হল আল্লাহ তা'আলা তাকে যে অবস্থায় ফেলেছেন, তার প্রতি অনীহা না থাকা। অর্থাৎ, অন্তরে ফকীরীকে খারাপ মনে করবে না এবং ভাববে না যে, আল্লাহ তার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নি। এটা সর্বনিম্ন স্তর এবং ফকীরের জন্যে এটা ওয়াজিব। এর খেলাফ হারাম। রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তির উদ্দেশ্যও তাই। তিনি বলেন ঃ হে ফকীর সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন কর, যাতে তোমরা তোমাদের ফকীরীর সওয়াব পাও, অন্যথায় সওয়াব পাবে না। এর উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরীতে খুশী থাকা। আরও উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরী প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা যে, প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ তিনি অবশ্যই দেবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ফকীরী দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শাস্তিও দেন, সওয়াবও দেন। সওয়াব দেয়ার পরিচয় এই, তিনি বান্দার অভ্যাস ভাল করে দেন। ফলে, সে পরওয়ারদেগারের আনুগত্য করে এবং কারও কাছে নিজের দারিদ্র্যের অভিযোগ করে না; বরং সে জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে শাস্তি দেয়ার আলামত এই, ফকীর চরিত্রহীন হয়, আল্লাহর নাফরমানী করে এবং ঘনঘন অভিযোগ করে। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ফকীরী ভাল নয়; বরং যে ফকীরীতে অসন্তুষ্টি ও অভিযোগ নেই, তাই ভাল।

ফকীরের বাহ্যিক আদব হল, কারও কাছে না চাওয়া, নিজের সুখ ও সচ্ছলতা প্রকাশ করা, কারও কাছে অভিযোগ না করা এবং দারিদ্র্যকে গোপন রাখা বরং এই গোপন রাখাকেও গোপন রাখা। হাদীস শরীফে

আছে—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা অভাবগ্রস্ত ফকীরকে ভালবাসেন— যে সওয়াল করা থেকে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন —

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

অর্থাৎ, সওয়াল না করার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি তাদেরকে ধনী মনে করে।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় সহনশীলতা উত্তম আমল। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ দারিদ্র্য গোপন করা পুণ্যের অন্যতম ভান্ডার।

অন্যের সাথে ফকীরের মেলামেশার আদব হল এই, কোন ধনীর সামনে তার ধনাঢ্যতার কারণে বিনয়ী হবে না, বরং অহংকার করবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সওয়াব লাভের আশায় ফকীরের সামনে ধনীর বিনয়ী হওয়া খুবই উত্তম। এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে ধনীর সামনে ফকীরের অহংকার করা। আল্লাহর উপর ভরসা করে ফকীরের এ অবস্থাটি হচ্ছে একটি উচ্চ মর্তবা। কিন্তু নিম্ন মর্তবা হল, ফকীরের ধনীদের কাছে না বসা এবং ধনীদেরকে নিজের কাছে বসাতে আগ্রহী না হওয়া। কেননা, এগুলোই হচ্ছে লোভ ও লালসার উৎস।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীর ধনীদের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে জানবে, সে রিয়াকার আর বাদশাহের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে মনে করবে, সে চোর। জনৈক সাধক বলেন ঃ ফকীর যখন ধনীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তার আস্থা ঢিলে হয়ে যায়। যখন তাদের কাছে প্রত্যাশা করে, তখন পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর যখন তাদের মধ্যে বসবাস করতে থাকে, তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ফকীরের উচিত, ধনীদের খাতিরে ও তাদের দান পাওয়ার লোভে সত্যপ্রকাশে দ্বিধা না করা। বরং সে যা সত্য ও সঠিক মনে করবে, তা বলে দেবে।

ফকীরের নিজের ক্রিয়াকর্মে আদব হল ফকীরীর কারণে কোন এবাদতে অলসতা না করা এবং খরচ বাদে কিছু অর্থ বেঁচে গেলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে দ্বিধা না করা। কেননা, স্বল্প পুঁজিওয়ালার চেষ্টা ও সাধনা এটাই। এর সওয়াব ধনীর দেয়া অনেক ধনের সওয়াবের চেয়ে বেশী। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, খয়রাতের এক দেরহাম আল্লাহ তা'আলার কাছে লক্ষ দেরহামের চেয়ে উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এটা কিরূপে হতে পারে? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি তার অগাধ ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দেরহাম বের করে খয়রাত করল। অপরদিকে এক ব্যক্তির কাছে দু'দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। সে তা থেকে মনের খুশীতে এক দেরহাম দান করে দিল। এখানে এক দেরহামওয়ালা লক্ষ দেরহামওয়ালার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

ফকীরের উচিত অর্থ সঞ্চয় না করা বরং প্রয়োজন পরিমাণে রেখে বাকীটা দান করে দেয়া। সঞ্চয় করার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, শুধুমাত্র একদিন ও একরাত্রির সামগ্রী রাখবে। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। দুই, চল্লিশ দিনের সামগ্রী রাখবে। আলেমগণ এটা হযরত মূসা (আঃ)-এর মেয়াদ থেকে চয়ন করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এ থেকে মনে করে নেয়া হয়েছে যে, জীবনের আশা চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা জায়েয। এটা মুত্তাকীদের স্তর। তিন, এক বছরের সামগ্রী সঞ্চিত রাখা। এটা সর্বনিম্ন ও সৎকর্মপরায়ণদের স্তর। যে ব্যক্তি এক বছরেরও বেশী সময়ের জন্যে সামগ্রীর ভাণ্ডার গড়ে তুলে, সে লোভীদের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবিগণের খাদ্যসামগ্রী এমনিভাবে বন্টন করতেন। অর্থাৎ, কোনোখান থেকে কিছু এলে তিনি তা থেকে কোন কোন পত্নীকে এক বছরের, কাউকে চল্লিশ দিনের এবং কাউকে এক দিন এক রাত্রির খাদ্যসামগ্রী দিতেন। তিনি একদিন একরাত্রির খাদ্য হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে দিতেন।

অযাচিতভাবে কিছু এলে ফকীর কি করবে ঃ ফকীরের কাছে কিছু এলে তার তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত— স্বয়ং অর্থের দিকে, দাতার উদ্দেশ্যের দিকে এবং নিজের উদ্দেশ্যের দিকে। অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখার অর্থ, তা হলো হালাল ও সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হলে তবে তা গ্রহণ করা, নতুবা হাত গুটিয়ে নেয়া। দাতা যদি মন জয় করা ও মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে সেটাকে বলা হয় "হাদিয়া"। আর যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে তার নাম সদকা ও খয়রাত। হাদিয়া গ্রহণ

করতে কোন দোষ নেই। বরং এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি কোন কোন হাদিয়া কবুল করতেন এবং কারও কারও হাদিয়া ফিরিয়ে দিতেন এবং বলতেন— আমি মনস্থ করেছি, কোরেশী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী ছাড়া কারও হাদিয়া গ্রহণ করব না। কোন কোন তাবেঈও এমনটা করেছেন। সেমতে কাতাহ মুসেলীর কাছে একবার পঞ্চাশ দেরহামের একটি থলে এলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আত্তার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যার কাছে অযাচিতভাবে কোন রুযী আসে এবং সে তা ফিরিয়ে দেয়, সে যেন আল্লাহর কাছেই তা ফেরত দেয়। অতঃপর তিনি থলেটি খুলে তা থেকে একটি দেরহাম গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দিলেন। হযরত হাসান বসরীও এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ও খোরাসানের চিকন বস্ত্রের একটি থান প্রেরণ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মানুষের কাছ থেকে এ প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর কাছে সওয়াবের কোন অংশ পাবে না।

এ থেকে বুঝা যায়, যারা আলেম ও ওয়ায়েয, তাদের দান গ্রহণ করা খুবই খারাপ। হযরত হাসান বন্ধু-বান্ধবের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। হযরত ইবরাহীম তায়মী বন্ধুদের কাছ থেকে এক-দু'দেরহাম চেয়ে নিতেন। কিন্তু অন্য কেউ শত শত দেরহাম পেশ করলেও তা গ্রহণ করতেন না। আবার কারও কারও নিয়ম ছিল কোন বন্ধু তাদেরকে কিছু দিলে তারা বলত এটা নিজের কাছেই রেখে দাও এবং ভেবে দেখ এটা নেয়ার পর যদি আমি তোমার মনে নেয়ার পূর্বের তুলনায় উত্তম হই, তবে আমাকে জানিও। আমি নিয়ে নেব। নতুবা নেব না। এ অবস্থাটির পরিচয় এই, যদি গ্রহীতা প্রত্যাখ্যান করে, তবে দাতার কাছে অপ্রিয় মনে হয় আর গ্রহণ করলে সে খুশী হয় এবং গ্রহণ করাকে নিজের প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। গ্রহীতা যদি জানে যে, এ হাদিয়ার মধ্যে কিছুটা করুণাও মিশ্রিত রয়েছে, তবে হাদিয়া গ্রহণ করা মোবাহ। কিন্তু সাচ্চা ফকীরদের মতে মাকরূহ।

হযরত বিশর বলেন ঃ আমি কারও কাছে কখনও কিছু চাইনি সিররী সিকতি ছাড়া। কেননা, আমার কাছে তার সংসার অনাসক্তি প্রমাণিত। তার হাত থেকে কোন বস্তু বের হয়ে গেলে তিনি খুশী হন। কাজেই তার বস্তু গ্রহণ করা আমি তাকে খুশী হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করি।

জনৈক খোরাসানী হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর কাছে কিছু অর্থ নিয়ে আগমন করল এবং বলল ঃ আপনি এগুলো ভোগ করুন। তিনি বললেন ঃ

এগুলো ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। খোরাসানী বলল ঃ ফকীরদেরকে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি এতদিন কোথায় বাঁচব যে, তোমার অর্থ ভোগ করব? খোরাসানী আরয করল ঃ আমার উদ্দেশ্য তা নয় যে, আপনি এ অর্থ চাটনী ও ব্যঞ্জনে ব্যয় করবেন, বরং আমি চাই যে, শিরনী, ফল-মূল ইত্যাদিতে ব্যয় করুন। হযরত জুনায়েদ কবুল করে নিলেন। খোরাসানী আরয করল ঃ বাগদাদ শহরে এমন কেউ নেই, যার অনুগ্রহ আমার প্রতি আপনার চেয়ে বেশী। হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ তোমার মত লোক ছাড়া অন্য কারও হাদিয়া কবুলও করা উচিত নয়।

যদি দাতা কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে, তবে এই দান যাকাত হলে ফকীর নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে, সে যাকাত পাওয়ার যোগ্য কি না। যদি বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে কবুল করাও সন্দেহজনক হবে। আর যদি দান-খয়রাত হয়, তবে ফকীর মনে মনে চিন্তা করবে, যদি সে এমন কোন গোনাহ করে থাকে, যা দাতা জানলে খয়রাত দেবে না, তবে গ্রহণ করা হারাম। উদাহরণতঃ কেউ এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খয়রাত দিল যে, লোকটি আলেম। কিন্তু বাস্তবে ফকীর এগুণে গুণান্বিত নয়। এমতাবস্থায় দান গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হারাম।

যদি দাতা লোক-দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে দান করে, তবে ফকীরের উচিত তার দান গ্রহণ না করা এবং তার কুউদ্দেশ্যে সাহায্যকারী না হওয়া। হযরত সুফিয়ান ছওরীকে কেউ কিছু দিলে তিনি তা ফেরত দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি যদি জানতাম, এ দানকে মানুষ গর্বভরে উল্লেখ করে না, তবে গ্রহণ করে নিতাম। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু পাঠালে আপনি তা ফিরিয়ে দেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি মমতা ও উপদেশের ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেই। কেননা, তারা দান করে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে এবং এ প্রকাশ হওয়াকে ভাল মনে করে। ফলে, তাদের মাল হাতছাড়া হয় অথচ সওয়াব পায় না। তাই আমি ফিরিয়ে দেই।

ফকীর দান গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি সে প্রয়োজন পরিমাণ বস্তুর অভাবগ্রস্ত হয়, তবে গ্রহণ করা উত্তম। হাদীসে আছে —

مَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الْآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا

অর্থাৎ, গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে সচ্ছল দাতা সওয়াবে তার চেয়ে বড় নয়।

অন্য এক হাদীসে আছে—

مَنْ اَتَاهُ شَيْءٌ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَّلَا اسْتِشْرَافٍ فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ -

অর্থাৎ, যার কাছে এ ধন-সম্পদের কিছু অংশ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, সে যেন একে আল্লাহর দেয়া রিযিক মনে করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সে যেন একে ফিরিয়ে না দেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে কিছু পায় এবং গ্রহণ না করে, সে একদিন চাইবে, কিন্তু পাবে না। সিররী সিকতী (রহঃ) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে কিছু প্রেরণ করতেন। একবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সিররী বললেন ঃ হে আহমদ, ফিরিয়ে দেয়ার বিপদকে ভয় কর। ইমাম আহমদ বললেন ঃ ফিরিয়ে দেয়ার কারণ এই, আমার কাছে এক মাসের খাদ্য মওজুদ আছে। তাই এটি আপনি নিজের কাছেই রাখুন। এক মাস পর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এখন দরকার নেই। কোন কোন আলেম বলেছেন, ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য এই আশংকা আছে, হতে পারে আল্লাহ তাকে শাস্তিস্বরূপ লোভাক্রান্ত করবেন। তাই আগত সম্পদ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়, তাহলে তা নিজের ধ্যানে মশগুলও থাকতে পারে অথবা তা দ্বারা অন্যান্য অসহায় ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য করে বদান্যতার পরিচয়ও দিতে পারে। যদি সে পরকালপন্থী সাধক হয় আর ভাবে, এ সম্পদ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রয়োজনের বেশী সম্পদ সঞ্চয় প্রবৃত্তির আনুগত্য ছাড়া কিছুই নয়। আর যে কাজ আল্লাহর জন্যে নিবেদিত নয়, তা শয়তানের জন্যে। সেদিকে পদার্পণ মানেই কলংকিত হওয়া।

সম্পদ গ্রহণের পদ্ধতিও দুটি। এক, প্রকাশ্যে গ্রহণ করে গোপনে সরিয়ে দেয়া অথবা অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দেয়া। এটা 'সিদ্দীক'দের স্তর। প্রবৃত্তির জন্যে খুবই কঠিন—যদি সাধনার উত্তাপে তা পরিশুদ্ধ না হয়ে থাকে। দুই, সম্পদ গ্রহণই না করা; বরং মালিক তার পছন্দ মোতাবেক তার চেয়ে অধিক অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে প্রদান করবে। এখানে প্রকাশ্যে লেনদেন

উত্তম, না গোপনে এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা "যাকাতের তত্ত্ব ও রহস্য' অধ্যায়ে করেছি। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) সিররী সিকতীর হাদিয়া কবুল করেননি তাঁর প্রয়োজন ছিল না বিধায়। কারণ তখনও তাঁর কাছে এক মাসের খাবার মওজুদ ছিল। তাছাড়া হাদিয়া গ্রহণপূর্বক অন্যদেরকে দিয়ে দেয়ার পথও ধরেননি। কারণ, ওতেও রয়েছে হাজার ঝামেলা। পরহেযগারী হলো, সংশয় ও ফিতনার জায়গা থেকে দূরে থাকা। মক্কার কিছু পড়শী আছে—তারা বলে, আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল, আমি তা আল্লাহর পথে খরচ করার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। একবার এক ফকীরকে দেখলাম খোদার ঘর তওয়াফপূর্বক বিড়বিড় করে বলছে—

প্রভু হে, তুমি জান আমি ক্ষুধার্ত—
পরনে আমার বস্ত্র নেই,
ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ আমি—
সর্বাবস্থায় তুমিই সহায়॥

আমি দেখলাম, তার গায়ের দুটো কাপড়ই ছেঁড়া। আবরূও ঢাকা যায় না। ভাবলাম, আমার পয়সাগুলো দিয়ে একে কাপড় কিনে দেয়ার চাইতে আর উত্তম দান হতে পারে না। আমি পয়সাগুলো তার কাছে নিয়ে এলাম। সামনে ধরলাম। সে তার মধ্য থেকে পাঁচটি দেরহাম তুলে নিল। বলল, চার দেরহাম দিয়ে দুটি চাদর কিনে নেব আর এক দেরহাম তিন দিনের খরচ হয়ে যাবে। এরচে' বেশী আমার দরকার নেই। আমি দ্বিতীয় রাতে তাকে দেখলাম। তার গায়ে দুটি নতুন চাদর। তার মধ্যে তখন শয়তানী সংশয়ের সৃষ্টি হলো। সে তখন আমার দিকে তাকাল। আমার হাত ধরল। আমাকে নিয়ে সাতবার বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করল। প্রতিবারের তওয়াফেই আমরা মূল্যবান খনিজ পদার্থ দেখতে পাচ্ছিলাম। কখনো স্বর্ণ, কখনো রূপা, কখনো ইয়াকূত, কখনো মোতি, কখনো ভিন্ন জওহর। দেখছিলাম আমাদের হাঁটু পর্যন্ত বেড়ে উঠছিল এগুলো। সে বলল, আল্লাহ তাআলা আমাকে এসবই দিয়েছেন; কিন্তু আমি ধরেছি যুহদ ও বৈরাগ্যের পথ। কারণ, এ সবই বোঝা আর বিপদ। এগুলো থেকে যৎসামান্য গ্রহণ করাটা বান্দার জন্যে রহমত ও নেয়ামত।

অর্থাৎ প্রয়োজনের বাইরে বান্দার কাছে যা থাকে, তা তার পরীক্ষাস্বরূপ। আর প্রয়োজনমাফিক যতটুকু প্রদত্ত হয়, তা দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ। এরশাদ হচ্ছে—

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, আমি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে—তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম (তা দেখার জন্যে) এই মর্তলোকের সকল কিছু সৃষ্টি করেছি তারই শোভাস্বরূপ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاحَقَّ لِابْنِ اٰدَمَ اِلَّا فِىْ ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيْمُ صُلْبَهٗ وَثَوْبٍ يُوَارِىْ عَوْرَتَهٗ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهٗ فَمَازَادَ فَهُوَ حِسَابُهٗ -

অর্থাৎ, তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক রয়েছে। তাকে পিঠ সোজা রাখার মত খাদ্য, তার আবরূ ঢাকবার মত পোশাক ও তাকে আশ্রয় দেয়ার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তা হিসাবের বিষয়।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনমাফিক এই তিনটি থেকে গ্রহণ করে, তাহলে সে প্রতিদান পাবে। যদি প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করে, তাহলে এর জন্যে আল্লাহর দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। যদি নাফরমানী করে, তাহলে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। মানুষকে সম্পদের দ্বারা পরীক্ষা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে কিংবা রিপুর তাড়নাকে দুর্বল করার মানসে কোন সম্পদ বর্জনের অঙ্গীকার করল। এ ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকার পূরণ করাই উত্তম। কারণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অভ্যাস একবার হয়ে গেলে বারবার তাই করতে চাইবে। তখন আর তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বর্জনই উত্তম। দাতাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে যুহ্দ। যারা 'সিদ্দীকীন', তারাই শুধু এই সাধনায় বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দরাজহস্ত হয়, অসহায় লোকদের দেখা-শোনার অভ্যাস থাকে, তাহলে সে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী গ্রহণ করতে পারে এবং অসহায়দের উদ্দেশ্যে গৃহীত সম্পদ যথাশীঘ্র খরচ করে ফেলাই উত্তম। রাখলেই আবার নতুন করে পরীক্ষায় পড়ার আশংকা। ওর সাথে মনও লেগে যেতে পারে। অনেকে আবার অসহায় মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে অবশেষে সম্পদের প্রেমে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ দ্বারা আদায় করার নিয়তে ঋণ করে এবং ঋণ আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দিবেন।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, আল্লাহর প্রতি তাদের উত্তম ধারণা অনুযায়ী তারা খরচ করেন। কথিত আছে, এক বুযুর্গ মারা যাওয়ার সময় ওসিয়ত করে যান, আমার সম্পদ তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিবে। এক, শক্তিশালী। দুই, দানশীল। তিন, ধনী। কেউ জিজ্ঞেস করলো, এর উদ্দেশ্য কি?

তিনি বললেন ঃ শক্তিশালী অর্থ— যারা আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে। দানশীল অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখে। আর ধনী অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। অর্থাৎ যদি ফকীর, সম্পদ ও দাতার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে ফকীর সেই সম্পদ গ্রহণ করতে পারে। তবে নেয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখবে, যা কিছু নিলাম, তা আল্লাহর কাছ থেকেই নিলাম, দাতা কেবলমাত্র মাধ্যম। তাকে আল্লাহ তাআলা দেয়ার জন্যেই পাঠিয়েছেন। সে দিতে বাধ্য।

এক ব্যক্তি হযরত শকীক বলখী (রহঃ), তাঁর মুরীদগণসহ আরও পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে দাওয়াত করল। খুব ভালো মানের খাবার তৈরী করল। তিনি যখন উপবেশন করলেন, তখন মুরীদদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ দাওয়াতকারী বলছে, যে ব্যক্তি একথা মনে না করে যে, এই খাবার আমি তৈরী করেছি, আমিই এই খানা পরিবেশন করেছি, তার জন্যে এই খানা হারাম। একথা শুনে সকলেই উঠে চলে গেল। তবে একজন লোক বসে রইল। তিনি অতবড় মাপের ছিলেন না। দাওয়াতকারী হযরত বলখীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর! আপনার কথা আমি বুঝিনি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের তাওহীদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছি। হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! তুমি বনী ইসরাঈলের হাতে আমার রিযিক প্রেরণ করেছ। সকালে একজনে খাওয়ায়, বিকালে অন্যজন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, আমি আমার বন্ধুদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। আমি তাঁদের রিযিক আমার বান্দাদের মধ্যে বড়দের দ্বারা বন্টন করে দেই। যেন এই ওসীলায় তারা সওয়াব লাভ করতে পারে। সুতরাং কেউ যদি কারও কাছ থেকে কিছু পায়, তাহলে সে যেন মনে করে এটা আল্লাহর দান। তিনি এই দাতাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন।

প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার অবৈধতা এবং অভাবী ব্যক্তির জন্যে সওয়ালের আদব ঃ জেনে রাখতে হবে, সওয়ালের ব্যাপারে অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর বাণী রয়েছে। আবার কিছু কিছু রেওয়ায়েতে সওয়ালের ব্যাপারে অনুমতিও রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সওয়ালকারী যদি ঘোড়ার উপরে আরোহণ করে আসে তবু তার একটি প্রাপ্য রয়েছে। তিনি আরও এরশাদ করেন, 'ভস্মীভূত খুরের অংশ দিয়ে হলেও ফকীরকে বিদায় কর। এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে, কারণ, সওয়াল করা একেবারেই হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম হলে হাদীসের মাধ্যমে এমন একটি নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হত না। সারকথা হল, মৌলিকভাবে সওয়াল করা হারাম, তবে একান্ত প্রয়োজনে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে।

সওয়াল করা বা অন্যের কাছে হাত পাতা এ জন্যে হারাম যে, এতে আর তিনটি হারাম কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়। এক, আল্লাহর প্রতি অভিযোগ। কারণ, সওয়াল করার অর্থই হল নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করা এবং নিজের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করা। আর এটা নিঃসন্দেহে অভিযোগ। বিষয়টিকে এ ভাবে বুঝা যেতে পারে যে, কারো ভৃত্য যদি অন্যের কাছে সওয়াল করে, তাহলে এতে মনিবের অসম্মান হয় এবং প্রকারান্তরে মনিবের প্রতিই শেকায়েত করা হয়। ঠিক তেমনি ভাবেই বান্দার জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হাত পাতার অর্থই হল আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আর এ জন্যেই সওয়াল করা হারাম হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে প্রয়োজনের সময় হালাল হতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময়ও মৃত বস্তুও হালাল হয়ে যায়।

দুই, সওয়ালকারী সওয়ালের মাধ্যমে নিজকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে অপমানিত করে। আর কোন ঈমানদারের জন্যেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট নিজকে অপমানিত করার অনুমতি নেই। সে নিজকে একমাত্র প্রভুর কাছেই ছোট করবে, এর মধ্যেই রয়েছে তার জন্যে সীমাহীন ইযযত। অন্যান্য মানুষ সকলেই তার মত। সুতরাং এমনিতেই প্রয়োজন ছাড়া সম পর্যায়ের কারও কাছে নিজকে ছোট করা উচিত নয়।

তিন, সওয়ালের মাধ্যমে অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা, অনেক সময় যার কাছে হাত পাতা হয়, সে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে রাযী থাকে না, বরং লজ্জা পাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে অথবা লোক-দেখানোর জন্যে সওয়ালকারীর দাবী পূরণ করে থাকে । কিন্তু মনে মনে ঠিকই কষ্ট পায়।

আবার অনেক সময় দাবী পূরণ করতে না পারার কারণেও লজ্জা পেতে হয়। কারণ, মানুষ তাকে কৃপণ মনে করতে থাকে। মোটকথা, প্রথম অবস্থায় তার সম্পদের ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তার মানের ক্ষতি হয়। আর এ উভয় অবস্থার ক্ষতিই তার জন্যে কষ্টের কারণ এবং এ কষ্ট তাকে সওয়ালকারীর কারণেই পেতে হয়। সুতরাং সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষের কাছে হাত পাতা একটি ঘৃণিত কাজ এবং এর চাইতে বড় বৈধ কোন ঘৃণিত কাজ নেই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, রসূল (সাঃ) সওয়ালকে একটি ঘৃণিত কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এ ঘৃণিত কাজটি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বৈধ হতে পারে না। যেমন খাওয়ার সময় যদি কারও কণ্ঠনালীতে লোকমা আটকে যায় এবং পানি না থাকে, তাহলে প্রয়োজন মাফিক মদ পান করে গলার বিষম ছুটানোর অনুমতি রয়েছে।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে সওয়াল করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামে নিজের জন্যে আগুনের পরিধি বৃদ্ধি করে। হাদীসে আরও এসেছে, সচ্ছল ব্যক্তি সওয়াল করার কারণে কিয়ামতের দিন সে এমন ভাবে আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডল থাকবে অস্থিসার, তাতে মাংসের কোন উপস্থিতি থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সওয়ালকারীর সওয়াল তার মুখমন্ডলে দাগ হয়ে থাকবে। হাদীসের এ সমস্ত শব্দমালা দ্বারা সওয়ালের ব্যাপারে অবৈধতাই প্রমাণ হয়।

রসূল (সাঃ) একবার কিছু লোকের নিকট থেকে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর আনুগত্যের অঙ্গীকার নিলেন, এরপর ছোট একটি বাক্য বললেন যে, তোমরা কখনো কারও নিকট হাত পাতবে না।

প্রকৃতপক্ষে রসূল (সাঃ)-এর আদর্শই এমন ছিল যে, তিনি মানুষকে সওয়াল করার ব্যাপারে সর্বদা বারণ করতেন। তিনি বলতেন, যে আমাদের কাছে হাত পাতবে, তাকে তো আমরা দিব, কিন্তু যে আত্মনির্ভর থাকতে চাইবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আত্মনির্ভর রাখবেন। তিনি আরও বলেন, যে সওয়াল করবে না, সে আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। রসূল (সাঃ) আরও এরশাদ করেন, তোমরা মানুষের কাছে সওয়াল করবে না। আর সওয়াল যত কম করা যায়, ততই উত্তম। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনার কাছে কি সওয়াল করা যাবে? রসূল (সাঃ) বললেন, আমার কাছেও কম করবে।

হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন, একজন ভিক্ষুক মাগরিবের পর ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তিনি তার গোত্রের একজন লোককে বললেন, তাকে খাবার দিয়ে দাও। সে খাবার দিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর আবার তাকে ভিক্ষা করতে শুনলেন। তিনি গোত্রের লোকটিকে বললেন, আমি কি তোমাকে ভিক্ষুকটিকে খাবার দিতে বলিনি? লোকটি বলল, আমি তো তাকে খাবার দিয়ে দিয়েছি। হযরত উমর এবার ভিক্ষুকের ঝুলি পরীক্ষা করলেন, দেখলেন তাতে রুটির স্তূপ রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তো ভিক্ষুক নও, ব্যবসায়ী। অতঃপর তিনি ঝুলিটি নিয়ে যাকাতের উটের সামনে ঢেলে দিলেন এবং ভিক্ষুকটিকে দোররা মারলেন, আর বললেন, ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো এরূপ করবে না।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, সওয়াল করা যদি হারামই না হত, তাহলে তিনি ভিক্ষুককে দোররা মারলেন কেন এবং তার ঝুলিই বা ছিনিয়ে নিলেন কেন। এখানে কিছু সংখ্যক ফেকাহবিদ হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তারা মনে করেন যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটি ঠিক ছিল না। কারণ, ভিক্ষুককে তিনি আদবের জন্যে প্রহার করে থাকলেও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ঠিক হয়নি। কেননা, ইসলামে সম্পদ বাজেয়াপ্ত বা শাস্তি স্বরূপ জরিমানার কোন বিধান নেই।

আমি বলতে চাই, হযরত উমরের উপর ঐ সকল লোকদের আপত্তি উঠেছে তাদের অজ্ঞতার কারণে। হযরত উমর (রাঃ) ঐ সকল ফেকাহবিদের তুলনায় অনেক বড় ফকীহ। তিনি যতটুকু পরিমাণ ধর্মের রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, ততটুকু আর কেউ ছিল না। তেমনি প্রজাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি সবার চেয়ে ভাল জানতেন। হযরত উমরের কি এ কথা জানা ছিল না যে, সম্পদ গ্রহণ করে জরিমানা আদায় করা ইসলামে বৈধ নয়? অথবা এমনটা কি হতে পারে যে, তিনি জানতেন ঠিকই কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হয়ে আল্লাহর নাফরমানী করে ফেলেছেন। অথবা শাস্তি দিতে যেয়ে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন, যা রসূল (সাঃ)-এর আনীত শরিয়তে বৈধ নয়? কখনও না। এমনটা হতেই পারে না। মূলত হযরত উমর (রাঃ) যে কারণে এ কাজটি করেছিলেন সেটি হল, তিনি লোকটিকে সওয়াল করার অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন এবং অন্যদেরকে তিনি এ বিষয়টি জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসে তাকে দান করেছ, তা ভুল। কেননা, সে মূলত অভাবী

নয়, বরং মিথ্যুক ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়ত, সে যে খাদ্যবস্তুগুলো মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, সেগুলোর মালিক সে হয়নি। কারণ, প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করার কারণে রুটিগুলোর উপর তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে রুটিগুলোর মালিকের সন্ধান না থাকার কারণে সেগুলো মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়াও মুশকিল ছিল। ফলে, এ লাওয়ারিস সম্পদগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আর এ জন্যেই হযরত উমর (রাঃ) এগুলো বায়তুল মালের যাকাতের উটের খাদ্যের তালিকায় নির্ধারিত করে দিলেন। কেননা, যাকাতের উটের খাদ্যের ব্যবস্থাও বায়তুল মালের পক্ষ থেকেই করতে হয়। মোটকথা হল, প্রতারণার মাধ্যমে বা মিথ্যা কথা বলে ভিক্ষুকরা যে সম্পদ গ্রহণ করে থাকে, এগুলোর তারা মূলত মালিক হয় না এবং এগুলোর ব্যবহার তাদের জন্যে হারাম। তাদের উচিত এ ধরনের সম্পদ মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। হযরত উমরের কর্ম থেকে আমরা এ ধরনেরই শিক্ষা পাই।

যখন জানা গেল যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সওয়াল করা যায়, তখন এ কথাও জানতে হবে যে, 'প্রয়োজন' মূলত চার প্রকার। এক, একান্ত প্রয়োজন। দুই, বড় ধরনের প্রয়োজন। তিন, হালকা প্রয়োজন। চার, নিষ্প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজনওয়ালা ব্যক্তিকে চরম অভাবী বলা হয়। চরম অভাবীর অবস্থা হল— যেমন কেউ এমন ক্ষুধার্ত যে, সে নিজের উপর মৃত্যু বা অসুস্থতার আশংকা করে। অথবা সে এ পর্যায়ের দরিদ্র যে, নিজের সতর ঢাকার মত বস্ত্রও তার নিকট নেই। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্যে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে। তবে সওয়াল করার জন্যে অন্যান্য শর্তগুলোও বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন- যার নিকট সওয়াল করা হচ্ছে, তার আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততা। সওয়ালকারী ব্যক্তির উপার্জনের অক্ষমতা, ইত্যাদি। । কারণ, যার উপার্জন ক্ষমতা রয়েছে, তার জন্যে সওয়াল করা নাজায়েয।

প্রয়োজনের চতুর্থ নম্বরটি হল-নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজনীয়তা হল সচ্ছল ব্যক্তির অবস্থা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন কিছুর জন্যে অন্যের নিকট হাত পাততে হয় না। বরং যে বস্তুর জন্যে সে অন্যের নিকট হাত পাতবে এর সম পরিমাণ বা দ্বিগুণ তার নিজের কাছেই রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা হারাম। অথচ যদি তার কাছে এক বা একাধিকটি মওজুদ থাকে, তাহলে সওয়াল করা হারাম। পক্ষান্তরে যদি কারও কাছে

পরার মত কাপড় তো আছে, কিন্তু শীতের কাপড় নেই এবং শীত তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে অনুরূপ কোন ব্যক্তি সফরে আছে গন্তব্যে পর্যন্ত পৌছার ভাড়া তার কাছে নেই। অবশ্য খুব কষ্টে পায়ে হেঁটেও গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এমন ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা মোবাহ্—বৈধ। কারণ, তার প্রয়োজন তো স্পষ্ট। অবশ্য এক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ সওয়াল অপেক্ষা অনেক উত্তম। তবে সওয়াল করা মাকরূহ নয়। তবে শর্ত হলো, সত্য বলতে হবে। প্রয়োজনের বাস্তবতাটাও তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে যদি হেরফের করে যেমন—জামা আছে কিন্তু ছেঁড়া, বাইরে যেতে একটি ভাল কাপড় দরকার। গাধা ভাড়া করার পয়সা আছে কিন্তু সে ঘোড়া ভাড়া করার পয়সা চায়। এখানে সে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে শুধু প্রয়োজন বলে সওয়াল করল, তাহলে জায়েয হবে না। কারণ, এতেও এক রকমের ধোকা আছে। কিন্তু ধোকা না দিলে সমস্যা নেই। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি অভিযোগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করে কিংবা অন্যকে কষ্ট দিয়ে সওয়াল করলেও সেটা হারাম।

কেউ যদি বলে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে সওয়াল কিভাবে করা যাবে? তার জবাব হল, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করবে এবং ভিক্ষুকদের মত সওয়াল করবে না। বরং এভাবে বলবে, আমার যা কিছু আছে, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার নফস চাচ্ছে উপরে পরার জন্যে আরেকটি কাপড়। অথচ এটা না হলেও চলে যায়। এভাবে বললে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করা হলো না। আর লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচার উপায় হল, প্রয়োজনে নিজের বাপ, আত্মীয় কিংবা এমন কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চাইবে, যারা সওয়ালের কারণে তাকে ছোট মনে করবে না। অথবা এমন ব্যক্তির কাছে চাইবে, যিনি দানশীল এবং দান করার জন্যে টাকা জমা করে রেখেছে এবং কোন সওয়ালকারী আসলে সে খুশী হয়। কেউ তার দান কবুল করলে সে খুশী হয়, মনে করে তার উপর অনুগ্রহ করা হলো। এ ধরনের লোকের কাছে সওয়াল করাটা লাঞ্ছনা নয়।

কষ্টদান থেকে বেঁচে থাকার উপায় হল, সওয়াল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে না করে বরং ইশারা-ইংগিতে অবস্থার বর্ণনা দেয়া, যার দেয়ার আগ্রহ আছে সে যেন দিতে পারে। কিন্তু কোন মজলিস যদি এমন হয়, যেখানে সওয়াল করলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্যদের নজর পড়ে এবং সে দান না করলে

অন্যরা তাকে ভর্ৎসনা করে আর সেই ভর্ৎসনার ভয়েই সে বাধ্য হয়ে দান করে। তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের কাছে সওয়াল করার সময়ও নাম না নিয়েই সওয়াল করা উত্তম। যাতে সে ইচ্ছা করলে কাটিয়ে যেতে পারে। আর আন্তরিকভাবে দিতে চাইলে দিতে পারে। এমতাবস্থায় দিলে বুঝা যাবে খুশী হয়ে দিয়েছে। অনুরূপ দেয়ার সময় যদি সওয়ালকারী মনে করে দাতা লজ্জায় পড়ে দিয়েছে, উপস্থিতি কিংবা 'আমার' প্রতি লজ্জার আশংকা না থাকলে সে আদৌ দিত না, তাহলে এই অর্থ গ্রহণ হারাম। এটা কাউকে রাস্তায় ধরে মারপিট করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়ার মতোই। কেননা, বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে কারও মনে আঘাত দেয়া শরীরে আঘাত দেয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু কেউ যদি বলে, বাহ্যত তো সে লোক হাসিমুখেই দিয়েছে। সুতরাং তার মনে সওয়ালের কারণে কষ্ট হচ্ছে কি-না তা আমরা কিভাবে বুঝব? অথচ হাদীস শরীফে আছে—

إِنَّا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক বিষয়ের আলোকে ফয়সালা করি, আর গোপন বিষয়ের অধিপতি আল্লাহ তাআলা।

এর জবাব হল, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে শাসক যখন ফয়সালা করে ভেতরগত অবস্থা তার জানা থাকে না, তাই সে বাধ্য হয় বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করতে। অথচ মানুষের রসনা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলে থাকে। এটা তো হল একটা প্রয়োজনের ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমরা যাদের আলোচনা করছি, সেতো হলো আল্লাহ ও তাঁর বিশেষ বান্দার কথা। আল্লাহ তো মানুষের ভেতর-বাহির সব জানেন। সমান ভাবে জানেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে মালিক যদি লজ্জাবোধের খাতিরে দান করে, তাহলে ফেরত দেয়া চাই। আর যদি লজ্জাবোধের কারণে গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে আপাতত রেখে দিয়ে পরবর্তীতে হাদিয়া হিসাবে দিয়ে দেয়া উচিত। যদি সে হাদিয়াও কবুল করতে না চায়, তাহলে তার ওয়ারিসদের কাউকে দিয়ে দিলেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে গ্রহীতা মনে করছে দাতা সন্তুষ্ট চিত্তেই দিচ্ছে অথচ প্রকৃত অবস্থা হল সে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। আর এটা উদ্ধার করাও কঠিন। তাই মুত্তাকীগণের অনেকেই সওয়াল করাটাকেই সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলেছেন। হযরত বিশরী (রহঃ) একারণেই হযরত সিররী (রহঃ) ছাড়া অন্য কারও

কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। বলতেন, আমি জানি, সিররী কোন জিনিস দিতে পারলে খুশীই হয়। আর আমি তার পছন্দের বিষয়ে তাকে সাহায্যও করতাম। সওয়াল করতামও না। করতে জোর নিষেধ করতাম। কারণ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করা জায়েয নেই। আর প্রয়োজন তো হলো, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া। সওয়াল ভিন্ন যখন আর জীবন রক্ষার গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া চাওয়া ছাড়া কেউ কিছু দিচ্ছেও না। তখনই মাত্র সওয়াল করা যায়।

কোন কোন বুযুর্গের আমল ছিল, তাদেরকে কোন জিনিস দিলে তারা তার কিছু অংশ রেখে কিছু অংশ ফেরত দিতেন। যেমন রসূল (সাঃ)-এর দরবারে একবার কিছু ভেড়া, ঘি ও পনীর হাদিয়া নিবেদিত হল। রসূল (সাঃ) সেখান থেকে ঘি ও পনীর রেখে ভেড়া ফিরিয়ে দেন।

এটা ছিল তাঁদের অবস্থা যাঁদের কাছে চাওয়া ছাড়াই সম্পদ আসতো। অধিকন্তু মর্যাদা লাভের স্বার্থে যারা হাদিয়া দিত, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা দুই অবস্থায় সওয়াল করতেন। এক, একান্ত প্রয়োজনের সময়। যেমন হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। আর তাঁরা জানতেন, যাদের কাছে চাচ্ছেন, তারা আন্তরিকভাবে দিবেন।

দুই, ভাই-বন্ধুদের কাছে সওয়াল করা। প্রথম যুগের বুযুর্গগণ নিজেদের ভাইদের সম্পদ চাওয়া ছাড়াই ব্যবহার করতেন। কারণ, তারা জানতেন. এতে তারা খুশী হবে। মুখে উচ্চারণ কোন বড় বিষয় নয়। তাদের ক্ষেত্রে সওয়ালের দরকারই হত না। তারা সওয়াল বৈধ মনে করতেন এমন ক্ষেত্রে যে, যার কাছে চাচ্ছি, সে আমার প্রয়োজনের কথা জানলে নিজ থেকেই তা দিয়ে দিত। এক্ষেত্রে কোন হিল্লা বাহির করার দরকার হয় না। তাহলে সওয়ালকারীর তিন অবস্থা হলো—

এক— সওয়ালকারীর একীন আছে যে, দাতা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে।

দুই— সওয়ালকারী নিশ্চিত, দাতা আন্তরিকভাবে অসন্তুষ্ট।

এই দুই অবস্থার প্রথম অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। দ্বিতীয় অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

তিন— সওয়ালকারী ঠিক বুঝতে পারছে না দাতা কি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে, না নারায হয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সে তার মনকেই ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে—মনে যে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে ওটা বর্জন করবে আর যে বিষয়ে তৃপ্তি ও মনের সমর্থন পাবে, সেটাই গ্রহণ করবে। অনেক ক্ষেত্রে

এমনও হয় যে, দাতার সূক্ষ্ম স্বভাবের কারণে তার মনের অবস্থা কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না। একারণেই রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

অর্থাৎ, হাতের কামাই-ই হলো সর্বাধিক পবিত্র খাবার।

সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

অর্থাৎ, সচ্ছলতা সত্ত্বেও সওয়াল করা মানে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা কামনা করা। চাই বেশীর সওয়াল করুক বা কমের সওয়াল করুক।"

কিন্তু এই সচ্ছলতার সীমারেখা কি? এটা নির্ধারণ করা মুশকিল। তাছাড়া আমরা এটা করতেও পারি না। এটা শুধু নবীই (সাঃ) জানেন। হাদীস শরীফে আছে—

اِسْتَغْنُوا بِغِنَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْ غَيْرِهِ قَالُوا وَمَا هُوَ؟ قَالَ غَدَاءُ يَوْمٍ وَعَشَاءُ لَيْلَةٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহর ধনে ধনাঢ্যতা কামনা কর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ তা আবার কি? রসূল (সাঃ) বললেন ঃ একদিন ও একরাতের খাবার!

অন্য একটি হাদীসে আছে—

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا

'যার কাছে পঞ্চাশ দেরহাম কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে সওয়াল করল, সে উপরি সওয়াল করল।

অন্য একটি বর্ণনায় চল্লিশ দেরহামের কথা আছে। হাদীস সবগুলোই বিশুদ্ধ। ধনী হওয়ার সীমারেখাও ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের শ্রেণী-বিভেদের কারণে সচ্ছলতার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ

করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে আছে—

لَاحَقَّ لِابْنِ اٰدَمَ اِلَّا فِىْ ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيْمُ بِهٖ صُلْبَهٗ وَثَوْبٍ يُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتَهٗ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهٗ فَمَازَادَ فَهُوَ حِسَابٌ -

অর্থাৎ, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক আছে। পিঠ সোজা রাখতে পারে পরিমাণ খাবার, আবরু ঢাকার মত কাপড় ও আশ্রয় গ্রহণ করার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তার হিসাব দিতে হবে।

অর্থাৎ খাবার, পোশাক ও ঠিকানা— এ তিনটিই হল মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজনের তিনটি মৌলিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি হলো মৌলিক প্রয়োজন বা এ জাতীয় যা আছে। যেমন এক ব্যক্তি মুসাফির। তার জন্যে ভাড়ারও প্রয়োজন হবে যদি সে পায়ে হাঁটতে না পারে। এই ভাড়াও তখন ঐ তিনটির মধ্যে গণ্য হবে। অনুরূপ যাদের ভরণ-পোষণ তার উপর জরুরী, সেগুলোও এরই মধ্যে শামিল। তবে এ ক্ষেত্রে একজন দ্বীনদারের প্রয়োজনই তার প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে। একান্ত স্বাভাবিক দিন গুজরানই হবে তার প্রয়োজন—যদি তা একান্ত স্বভাব বিরোধী না হয়।

খাদ্যের মধ্যে সারা দিন-রাত এক মুদ্ অর্থাৎ, প্রায় দেড় পোয়া ধর্তব্য। এই পরিমাণ প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে হবে যদিও তা সবই হয়। সব সময় ব্যঞ্জন থাকা প্রয়োজনের বাইরে। এটা সম্পূর্ণ বর্জন করাও কষ্টকর। তাই মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করার অনুমতি রয়েছে।

বাসস্থানের পরিমাণ কমপক্ষে ততটুকু হওয়া দরকার, যতটুকুতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এতে সাজ-সজ্জার কোন কথা নেই। অতএব, সাজ-সজ্জা অথবা ঘর প্রশস্ত করার জন্যে সওয়াল করা অপ্রয়োজনীয় সওয়ালরূপে গণ্য হবে। এটা উপরোক্ত হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সময়ের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ একদিন ও এক রাত্রির খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। বস্ত্র ও বাসস্থান জরুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সওয়াল করলে তার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন পরবর্তী দিন হবে। দুই, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিনে হবে। তিন, যার প্রয়োজন এক বছরে হবে। এখন আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলা যায়, যার কাছে এ পরিমাণ আসবাবপত্র আছে যে, তার এবং তার পরিবারের এক বছরের

জন্যে যথেষ্ট, তার সওয়াল করা হারাম। কেননা, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের ধনাঢ্যতা। হাদীসে বর্ণিত পঞ্চাশ দেরহাম এ ধনাঢ্যতারই সীমা। যদি এমন বস্তু হয় যে, এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হবে, তবে দেখা উচিত, সওয়ালকারী প্রয়োজনের সময়ও সওয়াল করতে সক্ষম কিনা এবং তখন সওয়াল করার সুযোগ থাকবে কিনা? যদি সক্ষম হয় এবং সুযোগও থাকে, তবে এই মুহূর্তে সওয়াল করা জায়েয হবে না। কেননা, যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে জীবিত না-ও থাকতে পারে। জীবিত না থাকলে তো প্রয়োজনই হবে না। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, প্রয়োজনের সময় সওয়ালের সুযোগ থাকবে না এবং কোন দাতা পাওয়া যাবে না, তবে এ মুহূর্তে সওয়াল করা বৈধ। কেননা, এক বছর বেঁচে থাকার আশা করা অবান্তর নয়।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতে রিযক আসার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থার অধিকারী, সে একদিনের খাদ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে তার মর্তবা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক বড়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন তার ও তার পরিবারের আজকের রিযক দিয়েছেন, তখন কালকের জন্য ভয় করা বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া অন্য কোন কারণে হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং তোমাদেরকে নির্লজ্জ কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ ওয়াদা দেন আপন ক্ষমা ও অনুগ্রহের।

সওয়ালও মন্দ বিষয়, যা কেবল প্রয়োজনের জন্যেই বৈধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর সওয়াল করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে দেখা দেবে, তার অবস্থা সে ব্যক্তির তুলনায় বেশী খারাপ, যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এক বছর পরেও প্রয়োজনের জন্যে রেখে দেয়। শরীয়তের বাহ্যিক ফতোয়ার দিক দিয়ে এতদুভয় কাজই বৈধ। কিন্তু উভয় কাজের কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত, উচ্চাশা এবং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অনাস্থা, যা মূলত বিনাশকারী বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে সঠিক পথ অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সত্যাশ্রয়ী ফকীরগণের কিছু অবস্থা ঃ হযরত বিশর (রহঃ) বলেন ঃ

ফকীরগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা সওয়াল করে না এবং কেউ দিলে গ্রহণ করে না। এরূপ ফকীর ইল্লিয়্যীনে আধ্যাত্মিক লোকদের সাথে থাকবে। দুই, যারা সওয়াল করে না কিন্তু কেউ কিছু দিলে গ্রহণ করে। তারা নৈকট্যশীলদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকবে। তিন, যারা প্রয়োজনের সময় সওয়াল করে। তারা আসহাবে ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, সওয়ালের নিন্দায় সকলেই একমত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে হযরত শাকীক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ খোরাসানে আপনার বন্ধুদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে আপনি কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এই অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদেরকে কেউ কিছু দিলে তারা শোকর করে, আর না দিলে সবর করে। হযরত শাকীক বললেন ঃ বলখের কুকুররাও তাই করে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে আপনার মতে ফকীর কারা? তিনি বললেন ঃ ফকীর তারা, যাদেরকে কিছু না দিলে শোকর করে, আর দিলে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দেয়া বস্তু তারই হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ থেকে জানা গেল যে, সবর, শোকর ও সওয়ালের ক্ষেত্রে বুযুর্গগণের স্তর অনেক। এগুলোর পার্থক্য জানা অধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এগুলো না জানলে তারা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারবে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে সুন্দরতম কাঠামোতে সৃষ্টি করে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর "আলা ইল্লিয়্যীন" তথা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা যে ব্যক্তি উন্নতি ও অধঃপতনের মধ্যে পার্থক্য জানবে না, সে নিশ্চিতই উন্নতি করতে পারবে না।

সওয়াল করার কারণে মর্তবা উন্নত হওয়ার মত অবস্থাও কোন কোন সময় বুযুর্গগণের উপর প্রবল হয়ে যায়। সেমতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুযুর্গ হযরত আবুল হাসান নূরী (রহঃ)-কে মানুষের কাছে সওয়ালের হাত পাততে দেখে মনে মনে বললেন ঃ এরূপ বুযুর্গের সওয়াল করা মোটেই সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। জুনায়েদ বললেন ঃ নূরীর এ কাজকে খারাপ মনে করো না। তিনি মানুষকে কিছু দেবার জন্যেই মানুষের কাছে সওয়াল করেন— নেয়ার জন্যে নয়। অর্থাৎ, সওয়াল এ জন্যে করেছেন, যাতে দাতা আখেরাতে সওয়াব পায় এবং তার কোন ক্ষতি না হয়। বলা বাহুল্য, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সে উক্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাতে তিনি বলেন ঃ يَدُ الْمُعْطِى هِىَ الْعُلْيَا দাতার হাত উপরে। এরপর

হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এসো। দাঁড়িপাল্লা আনা হলে তিনি একশ' দেরহাম ওযন করলেন, অতঃপর আরও এক মুষ্টি দেরহাম এই একশ' দেরহামের সাথে মিলিয়ে বললেন ঃ এগুলো নূরীর কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে দান কর। বর্ণনাকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে বললাম, ওযন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। কিন্তু তিনি এক শ' দেরহাম ওযন করলেন এবং এর সাথে অগুনতি এক মুষ্টি মিলিয়ে দিলেন। এতে তো পরিমাণ নির্দিষ্ট হল না। এর মর্ম কি? তিনি তো বিজ্ঞ ব্যক্তি! কিন্তু প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। অতঃপর দেরহামের থলেটি আমি হযরত নূরীর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা আন। অতঃপর তিনি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে একশ' দেরহাম ওযন করে বললেন ঃ এগুলো জুনায়েদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং বলো, আমি তার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি। একশ' দেরহামের বেশী যা আছে, তা নিয়ে নিলাম। তার একথা শুনে আমার বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ জুনায়েদ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সে রশির উভয় মাথা নিজেই ধরতে চায়। সে একশ' দেরহাম মেপে সেটাকে নিজের মনে করে আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার জন্যে দিয়েছে। এর সাথে এক মুষ্টি বিনা ওযনে যা দিয়েছে, সেটা আল্লাহর নিয়তে দিয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা ছিল, তা গ্রহণ করেছি, আর যা তার নিজের ছিল, তা ফেরত দিয়েছি। অতঃপর আমি এই মুদ্রাগুলো হযরত জুনায়েদের কাছে নিয়ে এলে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ নূরী নিজের মাল গ্রহণ করেছেন এবং আমার মাল ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাক, আল্লাহ মালিক।

এখানে দেখা উচিত যে, এই বুযুর্গগণের অন্তর কেমন স্বচ্ছ ছিল এবং তাদের অবস্থা কেমন একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে ছিল। তারা একে অপরের মনের খবর মৌখিক কথাবার্তা ছাড়াই জেনে নিতেন। এটা ছিল হালাল খাদ্য, সংসারবিমুখতা এবং সর্বতোভাবে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ারই ফল। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ সব বিষয় অস্বীকার করে, সে মূর্খ। যেমন কেউ ঔষধ পান না করেই সেটা যে বিরেচক তা অস্বীকার করে। অনেক দিন সাধনা করার পরও যদি এটা কেউ অর্জন করতে না পারে এবং সে অন্যের জন্যেও এটা অস্বীকার করে, তবে সে সেই ব্যক্তির মত, যে বিরেচক ঔষধ পান করে কিন্তু তার কোন অভ্যন্তরীণ রোগের কারণে দাস্ত হয় না। ফলে, যে ঔষধটি বিরেচক, সে তা অস্বীকার করে বসে। এ ব্যক্তি মূর্খতায় যদিও প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম, কিন্তু সে-ও যে পূর্ণ মূর্খ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুহদ

যুহদ তথা সংসার অনাসক্তি অধ্যাত্ম পথের পথিকগণের একটি উৎকৃষ্ট মকাম। এটা এলম, হাল ও আমলের মাধ্যমে গঠিত হয়। আমাদের মতে যুহ্দের মানে হচ্ছে এক বস্তু থেকে অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আগ্রহ পোষণ করা। যে ব্যক্তি কোন বস্তু থেকে অন্য বস্তুর প্রতি আগ্রহ করে, সে প্রথম বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ থেকে বুঝা গেল, যুহদের জন্যে দুটি বস্তু প্রয়োজন। এক, যার দিক থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুই, যার প্রতি আগ্রহ পোষণ করা হয়। এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুর তুলনায় উত্তম হওয়া শর্ত। প্রথম বস্তুর জন্যেও এমন হওয়া শর্ত যে, তার প্রতি কোন না কোন কারণে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমন বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়াকে যুহদ হলা হবে না, যা স্বয়ং কাম্য নয়। যেমন, পাথর ও মাটি থেকে যে আগ্রহ সরিয়ে নেয়, সে যাহেদ তথা দরবেশ হবে না। কেননা, এগুলোর প্রতি আগ্রহই হয় না। দরবেশ হবে সে লোক, যে টাকা-পয়সা বর্জন করে। দ্বিতীয় বস্তুর জন্যেও শর্ত এই যে, তা দরবেশের মতে প্রথম বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে হবে, যাতে সে তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। যেমন বিক্রেতা নিজের পণ্য সামগ্রী ততক্ষণ বিক্রি করে না, যতক্ষণ তার মতে বিনিময় উৎকৃষ্ট না হয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে —

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ

অর্থাৎ, তারা ইউসুফকে বিক্রি করে দিল সামান্য দামে— গোনাগুনতি কয়েক দেরহামের বিনিময়ে। এ ব্যাপারে তারা দরবেশ হয়ে গিয়েছিল।

আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইউসুফের ব্যাপারে দরবেশী প্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ, তারা লোভ করেছে যেন, পিতার মনোযোগ কেবল তাদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। এটা তাদের কাছে ইউসুফের তুলনায় অধিক প্রিয় ছিল। এই বিনিময় পাওয়ার আশায়ই তারা তাকে কম মূল্যে বিক্র করে দিল।

এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দুনিয়াতে যাহেদ তথা দরবেশ তাকেই বলা হবে, যে দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করবে, অর্থাৎ, আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে, সে আখেরাতের পক্ষে দরবেশ হবে। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যে বিশেষভাবে দুনিয়াকেই বিক্রি করে, তাকেই দরবেশ বলা হয়। যেমন "এলহাদ" বিশেষভাবে সেই প্রবণতাকেই বলা হয়, যা বাতিলের প্রতি হয়। নতুবা অভিধানে কেবল প্রবণতাকেই এলহাদ বলা হয়—বাতিলের প্রতি হোক অথবা সত্যের প্রতি।

যুহদের জন্যে এটাও শর্ত যে, যে বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হবে, তা কোন না কোনরূপে কাম্য হতে হবে। এ কারণেই যুহদ তখনই হবে, যখন এই বস্তুর তুলনায় দ্বিতীয় বস্তুটি অধিকতর কাম্য ও প্রিয় হবে। নতুবা প্রথম কাম্য বস্তুটি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যসব বস্তুর প্রতি বিমুখ হয়, এমনকি বেহেশতের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য না রাখে— কেবল আল্লাহর প্রতি আগ্রহ রাখে, সে সর্বাবস্থায় দরবেশ। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগসামগ্রীর প্রতি বিমুখ হয়, কিন্তু আখেরাতের ভোগসামগ্রী পাওয়ার বাসনা রাখে এবং বেহেশতের হূর, প্রাসাদ, নহর ও ফলমূলের লোভ পোষণ করে, সেও কতক দরবেশ হবে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কতক ভোগসামগ্রী ত্যাগ করে এবং কতক ত্যাগ করে না; যেমন ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং যশ-প্রতিপত্তি বর্জন করে না, এরূপ ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই দরবেশ বলা যাবে না। দরবেশদের মধ্যে তার মর্তবা তওবাকারীদের মধ্যে সেই তওবাকারীর অনুরূপ হবে, যে কোন কোন গোনাহ থেকে তওবা করে এবং কোন কোন গোনাহ থেকে করে না। তবে তার দরবেশী জায়েয হবে, যেমন কোন কোন গোনাহ্ থেকে তওবা করা জায়েয। কেননা, তওবা হচ্ছে নিষিদ্ধ ও হারামকে ত্যাগ করার নাম আর দরবেশী হচ্ছে বৈধ বিষয়াদি ত্যাগ করার নাম।

মানুষ কিছু কিছু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কিছু কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি শুধু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করে, সে দরবেশ নয়। দরবেশ যে বৈধ বিষয়টি ত্যাগ করবে, তা তার ক্ষমতাধীন হওয়াও শর্ত। কেননা, যে বস্তু অর্জন করার ক্ষমতা নেই, তা ত্যাগ করার কোন অর্থ হয় না। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারককে কেউ "হে দরবেশ" বললে তিনি বললেন ঃ দরবেশ হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয (উমাইয়া খলীফা)। কেননা, দুনিয়া তাঁর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আগমন

করেছে। তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি কি বস্তু ত্যাগ করেছি যে, দরবেশ হব?

যুহদের জন্য এলম দরকার, যা থেকে হাল উৎপন্ন হয়। আর এই এলম হল একথা জানা যে, যা ত্যাগ করা হবে, তার তুলনায় প্রার্থিত বস্তু উৎকৃষ্ট। যেমন ব্যবসায়ী যখন জেনে নেয় পণ্যের তুলনায় বিনিময় উত্তম, তখনই সে পণ্য ত্যাগ করতে আগ্রহী হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জেনে নেয় যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম এবং আখেরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, সে আখেরাত ও আল্লাহর প্রতিই উৎসাহী হয়। অতএব, দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্যের এলম যত বেশী হবে, যুহদের আগ্রহ তত বেশী হবে। যুহদে যতটুকু এলম দরকার, তা হচ্ছে আখেরাতকে উত্তম ও অক্ষয় জানা। এটা অনেক মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা দুনিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণ বিশ্বাসের দুর্বলতা অথবা কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ থাকা অথবা শয়তানের অনুসরণ ছাড়া কিছু নয়। তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে এবং তদবস্থায় মৃত্যু এসে তাদেরকে চেপে ধরে। তখন অনুতাপ ও অনুশোচনা ছাড়া কিছুই সঙ্গে যায় না। দুনিয়ার নিকৃষ্টতার প্রমাণ এই আয়াত قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ অর্থাৎ, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার খুবই নগণ্য।

আর আখেরাতের উৎকৃষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ

অর্থাৎ, আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা বললেন ঃ সর্বনাশ হোক তোমাদের, ঈমানদারের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াব উত্তম।

যুহদের হাল থেকে উদ্ভূত আমল হচ্ছে বর্জন করা ও অর্জন করা। অর্থাৎ, দুনিয়াকে তার সমস্ত উপকরণ ও সম্পর্কসহ এমনভাবে বর্জন করা যাতে তার মহব্বত অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে যায় এবং এবাদত ও আনুগত্যের মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। যে বস্তু অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তা চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ থেকেও দূর হতে হবে এবং এগুলো আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। নতুবা শুধু দুনিয়া বর্জন করলে এমন হবে, যেমন কেউ পণ্যদ্রব্য ক্রেতার হাতে দিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করে না।

যুহদের ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ -

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে উপস্থিত হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ আহা, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদেরকেও দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তারা বলল ঃ ধিক তোমাদেরকে, যে ঈমানদার, তার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াবই শ্রেষ্ঠ।

এ আয়াতে যুহদকে আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা যুহদের চূড়ান্ত প্রশংসা। আরও বলা হয়েছে—

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ, সবর করার কারণে তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে।

তাফসীরকারগণ বলেন ঃ যারা দুনিয়াতে যুহদ করতে গিয়ে সবর করেছে, আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, তাকেও দুনিয়ার কিছু অংশ দেই এবং সে আখেরাতে কিছুই পাবে না।

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

অর্থাৎ, আমি কাফেরদের কতককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব

জীবনের যে চাকচিক্য ভোগ করতে দিয়েছি, সেদিকে আপনি কখনও লক্ষ্য করবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী।

অন্য আয়াতে আছে ঃ

يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, তারা অখেরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে।

এটা কাফেরদের বিশেষণ। এ থেকে জানা যায়, মুমিন সেই, যে এর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত হয়। অর্থাৎ, আখেরাতকে পছন্দ করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ বিশৃঙ্খল ও রুযী অনিশ্চিত করে দেন। সে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। তার দুনিয়া ততটুকু অর্জিত হয়, যতটুকু লিখিত আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল আখেরাতের চিন্তা করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রচেষ্টাকে সংহত এবং জীবিকাকে সুরক্ষিত রাখেন। তার অন্তর ধনী হয়ে যায় এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে তার কাছে ধরা দেয়।

এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা কাউকে চুপ থাকতে ও দুনিয়াতে যুহদ করতে দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, তাকে প্রজ্ঞা শিখানো হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, সে অশেষ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ يُّحِبَّكَ اللّٰهُ فَازْهَدْ فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহর মহব্বত চাও, তবে দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন কর।

এতে যুহদকে মহব্বতের কারণ বলা হয়েছে।

আহ্‌লে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلزُّهْدُ وَالْوَرَعُ يَجُوْلَانِ فِى الْقُلُوْبِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَاِنْ

صَادَفَا قَلْبًا فِيْهِ الْاِيْمَانُ وَالْحَيَاءُ اَقَامَا فِيْهِ وَاِلَّا ارْتَحَلَا

অর্থাৎ, যুহদ ও পরহেযগারী মানুষের অন্তরসমূহে ঘুরাফেরা করে। যদি

ঈমান ও লজ্জাশীল কোন অন্তর পায়, তবে সেখানে থেকে যায়। অন্যথায় চলে যায়।

হযরত হারেসা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আমি নিশ্চিতই ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমার ঈমানের স্বরূপ কি? হারেসা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। দুনিয়ার পাথর ও সোনা আমার কাছে সমান। আমি যেন জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে আমার রবের আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই চিনেছ! এখন এর উপর কায়েম থেকো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এই বান্দার অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত হারেসা (রাঃ) ঈমানের স্বরূপ যুহদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

এক আয়াতে অছে—

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

এই অন্তর উন্মোচনের অর্থ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ যখন নূর প্রবেশ করে, তখন তার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এর কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এর লক্ষণ হচ্ছে ধ্বংসশীল দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং মৃত্যুর পূর্বে তার প্রস্তুতি নেয়া। এখানে যুহদকে ইসলামের লক্ষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহর কাছে যথার্থ লজ্জা কর। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে লজ্জা করি। তিনি বললেন ঃ না, কর না। কারণ, তোমরা এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না এবং এমন সামগ্রী সঞ্চয় কর, যা ভোগ কর না। এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই উভয় বিষয় আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ করার পরিপন্থী।

একবার এক স্থান থেকে একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমরা মুমিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মুমিন হওয়ার পরিচয় কি? তারা বলল ঃ বিপদে সবর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করা, আল্লাহর নির্দেশে সন্তুষ্ট থাকা এবং শত্রুর উপর

বিপদ এলে আনন্দিত না হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ যদি তোমরা এমনি হও, তবে যা খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করবে না, যে ঘর বসবাস করার নয়, তা নির্মাণ করবে না এবং যে বস্তু ত্যাগ কর, তার আগ্রহ করবে না। এই হাদীসে যুদহকে ঈমানের পরিশিষ্ট বলা হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) খোতবায় এরশাদ করলেন ঃ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করবে না, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অন্য কিছু মিশ্রিত না করার মানে কি? এর ব্যাখ্যা করে দিন। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়াকে প্রিয় মনে করা। কিছু লোক রসূলগণের মত কথাবার্তা বলে, কিন্তু কাজ যালেম শাসকবর্গের মত। অতএব, যার মধ্যে এসব বিষয়ের কোন কিছু নেই, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্ষুধার অবস্থা দেখে আমি কান্না সামলাতে পারিনি। আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, যদি আমি আমার পরওয়ারদেগারের কাছে স্বর্ণের পাহাড় প্রার্থনা করতাম, তবে আল্লাহ আমার ইচ্ছামত স্বর্ণের পাহাড় বশীভূত করে দিতেন এবং সে আমার সাথে সাথে চলত। কিন্তু আমি দুনিয়ার ক্ষুধাকে তৃপ্তির উপর, দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যতার উপর এবং দুঃখকে খুশীর উপর অবলম্বন করে নিয়েছি। হে আয়েশা! দুনিয়া মোহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গের জন্যে উপযুক্ত নয়। আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা বড় বড় পয়গম্বরগণের জন্যে যা পছন্দ করেছেন, আমার জন্যেও তাই পছন্দ করেছেন। যে আদেশ তাদেরকে দিয়েছেন, আমার জন্যে তাই মনোনীত করেছেন। কোরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অর্থাৎ, বড় বড় পয়গম্বরগণ যেমন সবর করেছেন, আপনিও তেমনি সবর করুন।

আল্লাহর কসম, আমি তাঁর আনুগত্য থেকে পালাতে পারি না। তাদের মত আমিও যথাসাধ্য সবর করব। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সবর করার শক্তিও নেই।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন অনেক দেশ বিজিত হল, তখন তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) পিতার খেদমতে আরয করলেন ঃ যখন দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আপনার কাছে আসে তখন আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করুন এবং আপনি নিজেও খান এবং অপরকেও খেতে দিন। হযরত উমর বললেন ঃ হে হাফসা, তোমার তো জানা আছে যে, স্বামীর অবস্থা তার পত্নী অধিক জানে। হযরত হাফসা বললেন ঃ হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি— তুমি কি জান না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর নবী রইলেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনও দিনের খাদ্য তৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি। তারা দিনে খেলে রাতে অভুক্ত থাকতেন এবং রাতে খেলে দিনে অভুক্ত থাকতেন। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু খয়বর বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ পেট ভরে খোরমাও খেতে পারেননি। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। এক রাত্রিতে কেউ সেটাকে চার ভাঁজ করে দিল। তিনি তার উপর খুব সুখে নিদ্রা গেলেন। অতঃপর জেগে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমাকে রাত্রি জাগরণে বাধা দিয়েছ। এখন থেকে কম্বলকে আগের মত দু'ভাঁজ করে বিছাবে। তুমি আরও জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরার কাপড় ধোয়ার জন্যে খুলতেন এবং ধুয়ে রৌদ্রে দিতেন। ইতিমধ্যে বেলাল এসে নামাযের কথা জানাত। নামাযে যাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে অন্য কাপড় থাকত না। তাই সে কাপড় শুকালেই তিনি নামাযে যেতেন। তুমি জান, বনী কুফরের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যে দুটি চাদর, একটি লুঙ্গি ও একটি উত্তরীয় তৈরি করেছিল এবং এগুলোর মধ্যে প্রথমে একটি চাদর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কারণ, অন্যগুলো তখনও তৈরি হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই একটি মাত্র চাদরই গায়ে জড়িয়ে নামাযে বের হলেন। চাদরের দুই প্রান্ত ঘাড়ের কাছে বেঁধে নিয়েছিলেন। কারণ, তখন তাঁর দেহে অন্য কোন কাপড় ছিল না। এভাবেই তিনি নামায পড়লেন।

মোটকথা, হযরত উমর কন্যার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুহদের অবস্থা এত বেশী বর্ণনা করলেন যে, হযরত হাফসা কাঁদতে লাগলেন এবং তিনিও সজোরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। মনে হচ্ছিল যেন এখনই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত উমরের আরও কথা বর্ণিত আছে।

তিনি আরও বললেন ঃ আমার দু'জন সঙ্গী ছিলেন, যারা একই পথে গমন করেছেন। এখন যদি আমি অন্য পথে চলি, তবে অচিরেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহর কসম, আমি তাদের মত জীবন নিয়েই সবর করব, যাতে তাদের সাথে তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পূর্বের পয়গম্বরগণ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। তাঁরা কম্বল ছাড়া অন্য কিছু পরতেন না। উকুন দ্বারা তাদের পরীক্ষা হত। এত বেশী উকুন হত যে, তারা উকুনের জ্বালায় মরোণোন্মুখ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এ অবস্থাই তাঁদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। মোটকথা, আল্লাহর নবী ও রসূলগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে অধিক জানতেন এবং আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুহদের অবস্থা ছিল এই, যা বর্ণিত হল।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে— কোরআনের এই আয়াত—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا ... الخ

যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ধিক দুনিয়ার প্রতি এবং ধিক দীনার ও দেরহামের প্রতি। অর্থাৎ, টাকা-পয়সা ও আশরফীর প্রতি। এতে আমরা সবাই আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সোনা-রূপার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। এখন আমরা কোন্ বস্তুর ভাণ্ডার গড়ে তুলব? তিনি বললেন ঃ তোমাদের এই বিষয়গুলো হাসিল করা উচিত— যিকরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং সৎস্বভাবা স্ত্রী, যে আখেরাতের কাজে স্বামীর সহায়তা করে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—

مَنْ اٰثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ بِثَلَاثٍ هَمًّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ اَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَغْنِىْ اَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ اَبَدًا -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত করে দেন। এক, এমন চিন্তা,

যা তাঁর অন্তর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। দুই, এমন দারিদ্র্য, যা তাকে কখনও ধনী হতে দেয় না। তিন, এমন লোভ, যা তাকে কখনও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। এটি পার হয়ে যাও। এর উপর প্রাসাদ নির্মাণ করো না। লোকেরা আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি অনুমতি দিলে আমরা একটি গৃহ নির্মাণ করে দেই, যাতে আপনি এবাদত করবেন। তিনি বললেন ঃ যাও, পানির উপর দালান কেমন করে টিকে থাকবে?

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমার সামনে এই প্রস্তাব রাখেন— আপনি চাইলে মক্কার সমস্ত কংকরময় ভূমিকে আপনার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। আমি আরয করলাম ঃ আমি চাই না; বরং আমি একদিন অভুক্ত থাকতে চাই এবং একদিন পেট পুরে খেতে চাই, যাতে যেদিন অভুক্ত থাকি, সেদিন আপনার দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করি এবং যেদিন খাই, সেদিন আপনার প্রশংসা ও হামদ করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলের সাথে বাইরে যান। সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে জিবরাঈল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় আমার পরিবারের লোকজন এক মুঠো ছাতুও পায়নি এবং এক মুঠো আটাও পায়নি। এ কথাটি শেষ করতে না করতেই তিনি হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি বজ্রনাদ শুনতে পেলেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের আদেশ হয়ে গেল নাকি? জিবরাঈল আরয করলেন ঃ না! বরং আপনার কথা শুনামাত্রই ইসরাফীল (আঃ) নীচে অবতরণ করেছেন। অতঃপর ইসরাফীল খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ আপনার কথা আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন। এখন আমাকে পৃথিবীর চাবি দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং একথা আরয করতে আদেশ করেছেন যে, আপনার মরযী হলে আমি মক্কার পাহাড়সমূহকে পান্না, চুনি ও সোনা-রূপায় পরিণত করে আপনার সাথে সাথে ঘুরার ব্যবস্থা করব। আর আপনি ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বাদশাহ হবেন এবং ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বান্দা হবেন। জিবরাঈল ইশারা করলেন, আপনি আল্লাহর জন্যে বিনয় করুন। সেমতে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) তিনবার বললেন ঃ আমি রসূল ও বান্দা থাকব।

এক হাদীসে আছে —

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ فَلْيَزْهَدْ فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ তাকে শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান দান করুন এবং পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকে সুপথ দান করুন, তার উচিত দুনিয়াতে যুহদ করা।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

مَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ يُسَارِعُ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهِىَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَّاتِ وَمَنْ زَهِدَ فِى الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتُ -

অর্থাৎ, যে জান্নাতের আগ্রহী হয়, সে সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হয়। যে জাহান্নামকে ভয় করে, সে কুপ্রবৃত্তিসমূহ ভুলে যায়। যে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করে। আর যে দুনিয়াতে যুহদ করে, বিপদাপদ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, মানুষকে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ করে আখেরাতের প্রতি আগ্রহী করার জন্যেই পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা মানুষের সাথে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তার অধিকাংশই দুনিয়ার অনিষ্ট ও নিন্দা সম্বলিত ছিল। এখানে তাদের সকল হাদীস ও বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। যতটুকু বর্ণিত হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ সম্পর্কে মনীষী জনদের উক্তিও অসংখ্য ও অগণিত। সেমতে বর্ণিত আছে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বদা মানুষের উপর থেকে আল্লাহর ক্রোধকে দূরে সরিয়ে রাখে— যে পর্যন্ত মানুষ তাদের হ্রাসপ্রাপ্ত দুনিয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে পর্যন্ত দুনিয়ার বিষয়াদিকে আখেরাতের বিষয়াদির উপর প্রাধান্য না দেয়। আর যদি প্রাধান্য দেয়, এরপর মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তবে আল্লাহ বলে

দেবেন—তুমি মিথ্যাবাদী। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা সকল আমলই করেছি; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়া থেকে যুহদ করার চেয়ে বড় আমল কোনটি পাইনি।

জনৈক সাহাবী এক তাবেঈকে বললেন ঃ তোমরা সাহাবীগণের তুলনায় আমল ও চেষ্টা বেশী কর। এতদসত্ত্বেও তারা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তারা তোমাদের তুলনায় দুনিয়াতে যুহদ বেশী করতেন। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন, আমাদের এ গোনাহই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে যুহদ করতে বলেন, আর আমরা দুনিয়ার প্রতিই ঔৎসুক্য পোষণ করি।

এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছওরীর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন আলেম ও যাহেদকে দেখার বাসনা রাখি। তিনি বললেন ঃ হতভাগা, এটা তো হৃত বস্তু, যা পাওয়া যায় না। ওয়াহব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। যখন জান্নাতীরা এসব দরজার দিকে ধাবিত হবে, তখন দারোয়ানরা বলবে— পরওয়ারদেগারের ইযযতের কসম, এসব দরজা দিয়ে যাহেদদের পূর্বে কেউ যাবে না। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনটি বিষয় কামনা করি—যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন (১) যেন আমার কাছে একটি দেরহামও না থাকে, (২) আমার উপর কোন ঋণ না থাকে এবং (৩) আমার হাড়ে যেন মাংস না থাকে। কথিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই তিনটি বাসনাই পূর্ণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, বাদশাহ একবার ফেকাহবিদ আলেমগণের কাছে কিছু পুরস্কার প্রেরণ করেন। তারা সেই পুরস্কার কবুল করে নেন; কিন্তু ফুযায়ল ইবনে আয়াযের কাছে প্রেরিত দশ হাজার দেরহাম তিনি কবুল করলেন না। এতে তার পুত্ররা আরয করল ঃ সকলেই কবুল করেছেন, আর আপনি দরিদ্রতা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা কেন? জওয়াবে হযরত ফুযায়ল কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক এমন, যেমন কিছু লোকের একটি বলদ ছিল, যা দ্বারা তারা হালচাষ করত। বলদটি যখন বুড়ো হয়ে হালচাষের অযোগ্য হয়ে পড়ল, তখন একদিন তারা সেটিকে যবাহ করে ফেলল। এখন দেখা যাচ্ছে, তোমরাও আমাকে যবাহ করতে চাও। কারণ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বৎসগণ, বুড়ো পিতাকে যবাহ করার তুলনায় তোমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়া উত্তম।

হযরত ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) পশম পরিধান করতেন এবং গাছের পাতা খেতেন। তাঁর মরে যাওয়ার মত কোন পুত্রও ছিল না এবং নষ্ট হওয়ার মত কোন গৃহও ছিল না। তিনি আগামীকালের জন্যে কিছুই রাখতেন না। যেখানে রাত হত, সেখানেই শুয়ে পড়তেন। হযরত আবু হাযেমের স্ত্রী একদিন স্বামীকে বলল ঃ এখন শীত সমাগত। তাই খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও লাকড়ী সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া উপায় নেই। তিনি বললেন ঃ এসব বস্তু ছাড়াও উপায় আছে। উপায় নেই কেবল এটি ছাড়া যে, আমরা মরব, এরপর পুনরুত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হব। এরপর হয় জান্নাত, না হয় দোযখ।

হযরত ইবরাহীম বলেন ঃ আমাদের অন্তরের উপর তিনটি পর্দা পড়ে রয়েছে। এগুলো দূর না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস স্পষ্ট হয় না। এক— উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হওয়া, দুই— হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করা এবং তিন— প্রশংসা শুনে আনন্দিত হওয়া। যে উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হয়, সে লোভী। যে হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করে, সে রাগী। রাগী মাত্রই শাস্তিযোগ্য। আর যে প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়, সে অহমিকা করে। অহমিকা আমলকে বাতিল করে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু আমাদেরকে দেননি, সেগুলোর অনুগ্রহ দেয়া বস্তুসমূহের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ, দেয়ার চেয়ে না দিয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন। এই উক্তিটিতে যেন নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيْضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُوْنَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, অথচ সে তা পছন্দ করে। যেমন তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে ক্ষতির ভয়ে পানাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

রোগীকে কুখাদ্য না দেয়ার পরিণতি হচ্ছে স্বাস্থ্য উদ্ধার, যা রোগীর কাম্য আর রোগীকে কুখাদ্য দেয়ার পরিণতি হচ্ছে রোগবৃদ্ধি, যা কারও কাম্য নয়। রোগী যদি এ বিষয়টি বুঝে, তবে সে বুঝতে পারবে, কুখাদ্য দেয়ার তুলনায় কুখাদ্য না দেয়ার আচরণটিই উত্তম।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়া ক্ষয়শীল— অক্ষয় নয়; বিপদের আবাসস্থল— সুখের আবাসস্থল নয়। যে একে চিনে নেয়, সে এর বিস্তৃতি দেখে আনন্দিত হয় না এবং সংকোচন দেখে দুঃখিত হয় না। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ চারটি বস্তু তথা ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতকারীর এবাদত খাঁটি হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোকদেরকে দেখেছি এবং এমন লোকদের সঙ্গ লাভ করেছি, যারা দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করে তুষ্ট হত না এবং কোন কিছু হারিয়ে দুঃখিত হত না। দুনিয়া তাদের দৃষ্টিতে মাটির চেয়েও নিকৃষ্টতম ছিল। তাদের কেউ পঞ্চাশ ও ষাট বছর জীবন অতিবাহিত করত এভাবে যে, তাদের কোন কাপড় ভাঁজ করা হত না এবং তাদের জন্যে উনানে হাঁড়ি চড়ানো হত না, মাটিতে বিছানা করা হতো না এবং নিজ গৃহে আহার করা হতো না। রাত হলে তারা দাঁড়িয়ে যেত সেজদা করার জন্যে, অশ্রু প্রবাহিত করার জন্যে এবং মুক্তির জন্যে, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করার জন্যে। কোন পুণ্য কাজ করলে তার শোকর আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তা কবুল করার জন্যে আবেদন করত।

যুহদের স্তর ঃ যুহদের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম ও সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দুনিয়াতে যুহদ করা এবং দুনিয়ার খাহেশ ও তার প্রতি টানও রাখা; কিন্তু মোযাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে সেই টানকে দমিত রাখা। এরূপ যুহদকারীকে "মুতাযাহ্হিদ" (যুহদের ভানকারী) বলা হয়। এটা যুহদের সূচনা। এরূপ ব্যক্তি আশংকার মধ্যে থাকে। কেননা, তার খাহেশ যে কোন সময় প্রবল হয়ে যেতে পারে। ফলে, সে দুনিয়ার দিকে ফিরে যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর হল দুনিয়াকে নিজের আগ্রহে বর্জন করা। যে বস্তুর আশা করেছে, তার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করার কারণে। যেমন কেউ দু' দেরহাম পাওয়ার আশায় এক দেরহাম ছেড়ে দেয়। এরূপ ব্যক্তি নিজের যুহদকে বুঝে এবং লক্ষ্য রাখে। ফলে, সে অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ কারণে যুহদের এ স্তরটিও ত্রুটিমুক্ত নয়।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নিজের খুশীতে যুহদ করা এবং যুহদের মধ্যেও যুহদ করা। অর্থাৎ, নিজের যুহদকে কিছুই মনে না করা। কেননা, সে দুনিয়াকে নিছক একটি অবস্তু মনে করে; যেমন কেউ মৃৎপাত্রের ভাঙা